টান

- মোহাম্মদ নাজমুল হাসান

আমি একজন সিম্যান (Seaman বা নাবিক)। সঙ্গত কারণেই আমার জাহাজের ভ্রমণ এখন আর শখ নয়, পেশাগত কারণেই ঘুরতে হয় এ দেশ থেকে আরেক দেশে, এক শহর থেকে অন্য শহরে। তাই হয়তো আমার মতো লোকদের ভ্রমণ কাহিনী লিখে শেষ করার মতো নয়।

এক.

আমি যখন প্রথম জাহাজে জয়েন করি, সেই প্রথম আমার ঘর ছেড়ে কোথাও যাওয়া। জীবনের জন্য, বাচার জন্য অবশ্যই। মিয়ানমার-এর রাজধানী ইয়াংগুন থেকে আমাকে এগারোজনের দলকে নিয়ে যাওয়া হলো জাহাজ M.V Sarah1-এ। এখানে নিজের সব কাজ করার পরও নিজের ডিউটি করতে হতো আমার মতো অলস এক ছেলেকে। দিনে চোদ্দ থেকে আঠারো ঘণ্টা ডিউটির পর নিজের কাপড়, ক্যাবিন, টয়লেট, সব কিছু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হতো। ফলে ঘুমের জন্য সর্বোচ্চ চার পাচ ঘণ্টা পেতাম। এমনিতেই বাড়ির জন্য মন খারাপ, তার উপর আবার সারা দিন পরিশ্রম। কারো সঙ্গে মন খুলে কথা বলার সুযোগ নেই।

এভাবে প্রথম এক মাস আমার প্রথম শিপ-এর চাকরি। তারপর ইয়াংগুন পোর্ট। আমার প্রথম পোর্ট।

মনের মধ্য খুব আগ্রহ বাড়ির কোনো খবর পাবার জন্য। একদিন ইয়াংগুন সিটিতে গেলাম। এরপর বাড়ির সবার সঙ্গে কথা বললাম মনের আনন্দে। চোখে পানি এসে গেল। আমার শিপ তেরো দিনের মাথায় পুরো লোড নিয়ে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে যায়। মাত্র চুয়ান্ন ঘণ্টার প্যাসেজ। কিন্তু অল্প প্যাসেজ যেন শেষ হতে চাইছিল না। এক ঘণ্টা এক বছরের মতো মনে হচ্ছি। শেষ পর্যন্ত আমার অপেক্ষার পালা শেষ হলো।

জাহাজ ভোর চারটায় চট্টগ্রামে অ্যাংকর করলো। ইঞ্জিন রুম থেকে এলে চট্টগ্রামের ইউরিয়া সার কারখানার আলো আর পতেঙ্গা চোখে পড়লো। মন আনন্দে ভরে উঠলো। মন হলো, এক জনম পরে যেন দেশে ফিরে এলাম। এর কিছু পর সাম্পান-এ করে লোকজন এলো তরকারি, ফল-মূল নিতে। তারা সবাই বাংলায় কথা বলে। এই লোকগুলোকে আমার তখন খুব কাছের মনে হয়েছে। বাংলা পত্রপত্রিকা দেখে এতো আনন্দ হয়েছি তা লেখার ভাষা আমার নেই। তারপর মা-বাবা, ভাই, আত্মীয়র সঙ্গে দেখা হলে মনটা আনন্দে ভরে উঠেছিল। আনন্দে চোখে পানি এসে গিয়েছিল।

এখনো শিপে চাকরি করি। আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। আমার এই কম্পানির শিপ দেশে যায় না। তাই ডিউটি শেষে দেশের কথা ভাবি। সকালের সূর্য উদয় দেখি আর ভাবি, একই সূর্য কি আমার দেশে উদয় হলো? সবাই আমাকে ভুলে নিজ কাজে মনোযোগী হয়েছে। আর আমি পুরনো দিনের কথা ভাবি, কবে দেশে যাবো। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করি, কোনো ভালো বন্ধুর খোজ করি বিভিন্ন দেশে। যেখানে পারি সেখানে নিজের দেশের ভালো দিকগুলো তুলে ধরি অন্য দেশিদের কাছে।

দুই.

শিপে চাকরি করে অনেক দেশ দেখার সুযোগ হয়েছে। একবার করাচিতে খুব মনে কষ্ট পেয়েছিলাম।

এক ট্রাক ড্রাইভার আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আচ্ছা, বাংলাদেশ কি পাকিস্তান থেকে উন্নত?

তাকে আমাদের গণতন্ত্রের কথা বললাম, আমাদের দেশের বিভিন্ন ভালো দিকগুলো বোঝালাম।

এক পর্যায়ে সে আমাকে প্রশ্ন করে, তোমাদের দেশে জায়ান্ট ক্রেইন আছে কি না।

আমি নিরুত্তর ছিলাম। জানতাম বাংলাদেশের কোনো পোর্টে জায়ান্ট ক্রেইন নেই। এর একমাত্র কারণ, আমাদের ডক শ্রমিকভাইদের কাজ কমে যাবে। শুধু এই যুক্তিতে কোনো আধুনিক প্রযুক্তিকে তারা বন্দরে ব্যবহারে অনুমতি দেয়নি এই তথ্যটা জানাতে লজ্জা বোধ হচ্ছিল।

আল্লাহ ভালো জানে কবে আমাদের দেশের জন্য গর্ব বোধ করতে পারবো এবং বলতে পারবো আমরা তোমাদের চেয়ে উন্নত।

তিন.

জীবনে একবার হলেও বে অফ বেংগলে জুন-জুলাই মাসে ভ্রমণে যাওয়া উচিত। তাহলে ভ্রমণকারীরা বুঝবেন এই নীল সমুদ্র শুধু শান্ত নয়, মাঝে মধ্যে এমন অশান্ত হয়ে যায় যে, অভিজ্ঞ নাবিকরাও প্রতিজ্ঞা করে এবার দেশে গেলে আর শিপে আসবো না।

কিন্তু সমুদ্রের টান বড় শক্ত। নাবিকরা তাদের সেই প্রতিজ্ঞা কিছু দিনের মধ্যে ভুলে যায়। আবার তৈরি করে নিজেকে অকূল সমুদ্রের জন্য।

জুবাইল, সউদি আরব থেকে
nazmulhomna@yahoo.com

নির্ভয়

- আপেল

লঞ্চে ভ্রমণ আমাদের পরিবারের জন্য একটি সাধারণ ব্যাপার। মাসে দুই তিনবার আমাদের পরিবারের বিভিন্ন সদস্যের নানান কাজে প্রায় সব সময়ই লঞ্চেই ঢাকায় আসে। আবার কাজ শেষে ওই লঞ্চই হলো প্রধান বাহন। কারণ নদী শান্ত থাকলে এই জার্নির মতো আরামের জার্নি আর হয় না। ক্যাবিন বুক করা থাকলে রাতে আরাম করে ঘুমিয়ে গন্তব্যে পৌছে পরের দিন পুরোটাই কাজে লাগানো যায়।

প্রায় পচিশ বছর আগের কথা। তখনকার দিনে লঞ্চগুলো আজকের দিনগুলোর মতো দৈত্যাকার ছিল না। কাঠের তৈরি এবং সাইজে অনেক ছোট ছিল। আজকালকার দিনের বড় সাইজের যন্ত্রচালিত নৌকার চেয়ে একটু বড় ছিল বৈকি। কিন্তু নদীর ঢেউ-তুফান তো এক রকমেরই ছিল। এখন ভাবতে অবাক লাগে, কিভাবে আমরা ওই রকম লঞ্চে জার্নি করতাম এবং মাঝে মধ্যে ঝড়-তুফানে পড়তাম।

আমার বাবার আবার ওই সকল লঞ্চগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ছোট লঞ্চটি প্রিয় ছিল। লঞ্চটির নাম উহ্য রাখলাম। কেন প্রিয় ছিল তা বলা মুশকিল। তবে লঞ্চটির স্টাফগুলো হয়তো বাবাকে একটু বেশি তোষামদি করতো। তাই চরম খারাপ আবহাওয়াতেও তিনি এই লঞ্চে চড়ে ঢাকা গিয়েছেন।

একবার তো ওই লঞ্চে চড়ে ঢাকা যাওয়ার পথে সলিল সমাধির রচনা হতে চলেছিল। আমরা ফুল ফ্যামিলি ঢাকার একটা বিয়ের অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণে রওনা হলাম। তখন জুন মাস ছিল। এ সময় মাঝে মধ্যেই নদীতে ঝড়-তুফান ওঠে। লঞ্চ প্রায় ছয়টায় বরিশাল থেকে ছাড়লো। নদী শান্তই ছিল এবং কোনো সিগনাল ছিল না। আমরা রাতে খাওয়া সেরে ক্যাবিনে ঘুমানোর আয়োজন করতে লাগলাম। হঠাৎ করে মনে হলো লঞ্চের দুলুনিটা একটু যেন বেড়ে গেল। বারান্দায় বের হয়ে দেখলাম রীতিমতো ঝড় ছুটছে। নদী আস্তে আস্তে ফুসে উঠছে। লঞ্চের যাত্রীদের মধ্যে একটা ত্রাস সৃষ্টি হয়ে গেল। সবাই দাড়িয়ে নদীর তাণ্ডবলীলা দেখতে লাগলো। আমি আমার ফ্যামিলি অর্থাৎ আমরা চার বোন, মা এবং ভাই সবাই যতো রকম দোয়া-দোরুদ জানা আছে সব পড়তে লাগলাম।

আস্তে আস্তে ঝড় ও নদীর ঢেউয়ের আকার আরো বাড়তে লাগলো। লঞ্চ এখন একবার এদিকে কাত হয়, আরেকবার আরেকদিকে কাত হয়। নদীর পানির ঝাপটা এখন দোতলার ডেকের ওপর ওঠা শুরু করলো।

মনে হলো এখন ইচ্ছা করলেই নদীর পানি ছুতে পারি। সবাই ভাবতে লাগলাম, আজকেই বেচে থাকার শেষ দিন। আমরা প্রাণ ভয়ে কাদতে শুরু করলাম।

এখানে একজন ছিলেন ব্যতিক্রম। তিনি হলেন আমার বাবা। তিনি এর মধ্যে নাক ডেকে ঘুমাতে লাগলেন। আমরা তাকে ওঠাতে গেলাম।

তিনি প্রচণ্ড বিরক্ত হলেন এবং বললেন, কিচ্ছু হবে না, তোরা ঘুমা। আবার একটু ঠাট্টা করে বললেন, আজকে যদি মরি তাহলে সব এক সঙ্গে মরবো, কাদার কেউ থাকবে না, সুতরাং চিন্তার কি আছে? আমাকে শান্তিতে ঘুমাতে দে। ঢাকায় অনেক কাজ পড়ে আছে।

জানতাম বাবা এসব ঢেউ–তুফানে একটুও ভয় করেন না। কিন্তু আজকে যেখানে প্রায় নিশ্চিত লঞ্চ ডুবতে যাচ্ছে সেখানে তার এ রকম প্রতিক্রিয়ায় রীতিমতো হতবাক হলাম। তার আশ্বাসের বাণী আমাদের মোটেও প্রভাবিত করলো তো না–ই, বরং মৃত্যু ভয় আরো কয়েক ডিগ্রি বেড়ে গেল পরের উক্তিতে। আমরা তাকে আর কিছু বলার সাহস পেলাম না। একটা বয়া ধরে সবাই দাড়িয়ে থাকলাম। লঞ্চ যদি ডুবেই যায় তাহলে এটাই হবে শেষ অবলম্বন।

সময় যেন আর শেষ হয় না। হঠাৎ করে লঞ্চ প্রায় একদিকে অনেকখানি কাত হয়ে গেল। যাত্রীদের ভয়াবহ চিৎকারে কানের পর্দা ফাটার উপক্রম হলো। ভাবলাম এই শেষ।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে লঞ্চের স্টাফরা ডেকের যাত্রীদেরকে ডেকের অপরদিকে যেতে বললো।

তারা প্রাণ ভয়ে তাই করলো।

লঞ্চ এবার মোটামুটি সোজা হলো। তারপর যাত্রীরা যাতে সমভারে ডেকের মধ্যে অবস্থান করে তার জন্য তারা তদারকি করতে লাগলো। সেই সময়ে আল্লাহতাআলার ইচ্ছায় তাদের উপস্থিত বুদ্ধির গুণে লঞ্চটি উল্টায়নি। কিন্তু ঝড়ের তাণ্ডবলীলা চলতে লাগলো। আমরা লঞ্চের স্টাফদের পাড়ে ভেড়াতে বললাম।

কিন্তু তা সম্ভব নয় বলে জানালো। কারণ এখন বাতাস যেদিকে বইছে সেদিকে লঞ্চ চালাতে হবে। তা না হলে লঞ্চ উল্টে যাবে।

এই রকম প্রায় সারা রাত জীবন–মৃত্যুর মাঝে কাটালাম।

বাবা গভীরভাবে নিদ্রাচ্ছন্ন।

ভোর চারটার দিকে নদী কিছুটা শান্ত হলো। আমরা ক্যাবিনের মধ্যে ঢুকলাম।

সকাল সাতটার দিকে ঢাকায় পৌছালাম। আমাদের সকলের চেহারায় রাত জাগা ও দুশ্চিন্তার ফলে চরম ক্লান্তির ছাপ।

কিন্তু বাবা সারা রাত আরাম করে ঘুমিয়ে রীতিমতো ফ্রেশ। আর একটু হেসে বললেন, বলেছিলাম না, কিছু হবে না।

উত্তরা, ঢাকা থেকে

পুতুল বৌ

- রেজা

প্রেম করে বিয়ে করেছি সাত বছর আগে। ১৯৯৮ সালের ঘটনা। ঠিক করলাম বেড়াতে যাবো নানার বাড়ি। পুতুলকে মায়ের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলাম আমি বিকেলে আসছি বলে। কিন্তু যেতে পারলাম না বিশেষ কাজের জন্য। পর পর দুই দিন চলে গেল, যেতে পারলাম না।

অবশেষে দুই দিন পর গেলাম। এদিকে বৌ আমার অপেক্ষায় না খেয়ে বসে আছে। যখন আমি পৌছালাম তখন আমার পুতুল বৌ (শখ করে ডাকি) ঘরের দরজা দিয়ে অভিমানে বসে আছে, কেন আমার আসতে এতো দেরি! তারপর ঘর থেকে বের হয়ে ছোট মামাতো বোনকে নিয়ে পাড়ি দিল নৌকায়।

আমি যেতেই ওদের নৌকা ততোক্ষণে অনেক দূরে।

আমার এক নানি বুদ্ধি দিলেন, তুই আরেকটা নৌকা নিয়ে গিয়ে তোর বৌয়ের অভিমান পর্ব শেষ কর।

যেই বলা সেই কাজ। আমিও আরেকটা নৌকা নিয়ে গেলাম। তারপর মামাতো বোনকে বললাম, তুই এই নৌকা নিয়ে চলে যা। তাকে বিদায় দিয়ে নৌকা ভেড়ালাম বিলের মাঝে পানিতে অর্ধেক ডুবে যাওয়া পাটের জমিতে। তারপর বৌয়ের সামনে বসলাম অভিমান ভাঙাবো বলে।

কিন্তু তিনি রেগে ফায়ার। গায়ে হাত দিলেই হাত ঝেড়ে ফেলে দেয়।

অনেক মিথ্যা বলে পুতুলের অভিমান ভাঙতে সফল হই। তারপর অনেক আদর-সোহাগ করে দুজন দুজনাকে জড়িয়ে ধরে হারিয়ে যাই সুখের রাজ্যে।

পুটিয়া, রাজশাহী থেকে

বালুচর

- মনোয়ারা

বেশ কয়েক বছর আগে ঈদের পরদিন আমরা সপরিবার বাবার বাড়ি বেড়াতে গিয়েছি। আমাদের বাপ চাচাদের চার ভাইয়ের একই বাউন্ডারি ওয়ালে ঘেরা বাড়ি। ছোট-বড় সবাই মিলে আমরা ভাই-বোন বত্রিশজন। তাছাড়া শরিক ভাই-বোন আছে। মোট কথা, ভাইবোন, ভাইয়ের ছেলেমেয়ে, বোনদের ছেলেমেয়ে মিলে সব একশ ত্রিশজন। বাড়িতে গেলে সব সময়ই একটি হই হই, রই রই অবস্থা থাকে। রাতের বেলা আড্ডা, কার্ড খেলা, চাদা তুলে খাওয়া-দাওয়া, সিনেমা দেখা, নৌকা ভ্রমণ একটা না একটা করাই চাই।

সে বছর রাতে আড্ডা দিচ্ছি, ছোট ভাই ইয়াকুব এসে বলে, আপা, নদীতে একটি নতুন চর জেগেছে। যাবেন নাকি? একেবারে নরসিংদীর কক্সবাজার, না দেখলে মিস করবেন।

বলার সঙ্গে সঙ্গে সবাই চিৎকার, চলেন আপা, চলেন আপা।

সম্মতি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চাদা উঠানো শুরু হয়ে গেল। রাত তখন এগারোটা বেজে গেছে। বাজারের দোকানপাট বন্ধ হয়ে যাবে। তাই একেক ভাই একেক দিকে ছুটছে। একজন নরসিংদী বাজারে, আরেকজন মিল গেট। কারণ এতোগুলো লোকের সকালের নাশতা, দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করা, নৌকার অর্ডার দেয়া ইত্যাদি।

যাহোক, সকাল নয়টায় নৌকা ঘাটে এসে গেছে। দাদা (বড় ভাই) সবাইকে তাগাদা দিয়ে তাড়াতাড়ি তৈরি হতে বলছেন। নাশতা করবো নৌকায়। সবাই গোসল করার জন্য কাপড় ব্যাগে ঢুকিয়ে রওনা দিচ্ছি। পানির কলসি, যার যার প্লেট, গ্লাস, কোক, নাশতা, দুপুরের খাবার সব রেডি। এখনি রওনা দেবো।

সরওয়ারকে সবাই ডাকছে আর একে একে সবাই নদীর ঘাটে যাচ্ছে। এমন সময় দেখি সরওয়ার দুটো বড় বড় চট, রিপনদের বাশের ঝাড় থেকে কয়েক টুকরো চিকন বাশ, দড়ি, বদনা, দা, ইট এসব নিয়ে হাজির।

আমরা বললাম, এগুলো দিয়ে কি হবে?

খায়রুল বললো, মেয়েরা বাথরুম করবে কোথায়? সেই জন্য এই ব্যবস্থা।

সবাই হেসে উঠলো।

যাহোক, সুন্দর মতো সব ব্যবস্থা হলো। কৃকেটের সরঞ্জামও নৌকায় উঠলো।

সাড়ে নয়টায় নৌকা ছাড়লো। দুই নৌকা পাশাপাশি। এদিক দিয়ে লিটন, আপা, ইয়াকুব এরা নাশতা ভাগ করে নেয়ায় এবং সবার সহযোগিতায় দশ মিনিটের মধ্যেই নাশতা বিলি শেষ।

নদীর দৃশ্য দেখতে দেখতে নাশতা করছি সবাই। শান্ত নদী, মৃদু মন্দ বাতাস খুব ভালো লাগছে। নাশতা শেষে একে একে বারো পনেরোজন ছাড়া সবাই ছই-এর উপরে উঠে বসেছে। কেউ কেউ গান আরম্ভ করে দিল। *এই পদ্মা..., সব সখিরে..., আমার সোনার বাংলা...* ইত্যাদি। প্রায় সবাই মিলে গান গেয়ে আনন্দ

করতে করতে যাচ্ছি। মাঝে মধ্যে স্পিড বোট বা লঞ্চ পাশ দিয়ে গেলে বড় ঢেউ এসে ধাক্কা লাগে আর নৌকা একাত-ওকাত হেলে যায়। সবাই চিৎকার করে ওঠে।

প্রায় এগারোটায় আমরা গন্তব্যে পৌছালাম। নৌকা ভেড়ানোর আগেই একে একে লাফিয়ে নামছে এবং দৌড় দিচ্ছে। নেমে আমিও এক দৌড়। সত্যি এক অপূর্ব চর। একটুও সবুজের চিহ্ন নেই। শুধু বালি আর বালি। এ বালিতে কোনো এক মহা শিল্পী ঝিকঝাক করে ছবি একে রেখেছে। সত্যি মুগ্ধ এবং সবাই ওয়াওসহ বিভিন্ন শব্দে তাদের অনুভূতি জানাচ্ছে।

সবাই দৌড়ালেও মোরশেদ ধীরে ধীরে কৃকেটের সরঞ্জাম নিয়ে নামছে।

সরওয়ার বাথরুমের সরঞ্জাম নিয়ে নামছে। আমরা মেয়েরা কাপড়ের ব্যাগ, পানির বোতল, টুকিটাকি বাচ্চাদের জিনিস নিয়ে নামছি।

আমরা দল বেধে স্বাধীনভাবে হাটছি।

দাদা সবাইকে বলে দিলেন দুইটার মধ্যে নৌকার কাছে চলে আসতে হবে।

এদিক দিয়ে কৃকেট খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে। বাথরুমও বানানো শেষ। কারণ কাজ নৌকায় ভাগ করে দেয়া হয়েছে। অপূর্ব বালি চরে এসে আমরা সবাই এতো খুশি যে, ভাষায় বর্ণনা করতে পারছি না। সত্যি অসাধারণ স্থান নরসিংদীর কক্সবাজার। এখানকার পানিগুলো এতো স্বচ্ছ যে, মাছ, শামুক, ঝিনুক শ্যাওলা সব স্পষ্ট দেখা যায়।

একটার দিকে সবাই চিৎকার দিয়ে ডাকাডাকি করে গোসলের জন্য একত্রিত হলো। বিভিন্ন ধরনের সাতার, ডুব দেয়া, ডুবছি খেলা গ্রুপে গ্রুপে, যে যেভাবে পারছে সে সেভাবেই করছে। যারা পারছে না তাদের মামা, খালারা সাহায্য করছেন।

গোসল প্রায় শেষ। এমন সময় কামাল চিৎকার করে ডাকছে, আপার বড় ছেলে অপু চোরা বালিতে পড়ে গেছে।

চার পাচজন তাকে তুলে নিয়ে আসে। কিছু পানি খেয়েছে। একটা পা মচকে গেছে। অপুকে কয়েকজন মিলে নৌকায় শুইয়ে দিল। পায়ে জলপটি দিল। অল্পক্ষণের জন্য সবারই মন খারাপ হয়ে গেল। আল্লাহকে ধন্যবাদ যে ওই রকম বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি।

প্রাথমিক টৃটমেন্ট দাদাই দিলেন।

তখন আর কেউ দেরি করলো না। সবাই গোসল সেরে নৌকায় উঠে এলো। সবাই ক্লান্ত আর ক্ষুধার্ত। তাই সবারই সহযোগিতায় খাবার খেয়ে মাঝিভাইয়ের খাওয়া শেষ হওয়ার পর আবার ফেরার পালা।

কচুরিপানার ওপর অতিথি পাখিরা বসে আছে। একটু বাধা পেলেই ঝাকে ঝাকে উড়ছে। বিকেলের আবহাওয়া আরো সুন্দর।

সবাই বলে উঠলো, আমরা আবার আসবো।

যখন নৌকা ঘাটে পৌছানোর প্রায় সময় হয়ে এলো তখন সূর্যটাও আমাদের বিদায় জানিয়ে রক্তিম আকাশে টুপ করে ডুব দিল।

নৌকা ঘাটে ভিড়লো মাগরিবেরও আজান শোনা যাচ্ছে। আকাশে অতিথি পাখিরাও কোনো অজানা ঠিকানায় উড়ে যাচ্ছে।

লালমাটিয়া, ঢাকা থেকে

কিংকর্তব্যবিমূঢ়

– এম.এ হক

ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা পাস করে তখন সবেমাত্র ডিগ্রি ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছি। সালটা হলো ১৯৮৯। রংপুর এলাকায় ব্যাপকভাবে কাজ করার জন্য আরডি-নাইন নামে একটি সংস্থা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছিল লোক

নিয়োগের। ঝোকের মাথায় দরখাস্ত এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দিয়ে পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করছি। উদ্দেশ্য দুটো – *এক.* জীবনে প্রথম ঢাকা যাওয়া। এবং *দুই.* যদি চাকরি পাই। তবে সবচেয়ে উত্তেজনাকর বিষয় ছিল স্টিমারে চড়ে নদী পার হওয়ার ইচ্ছা।

ছোটবেলায় আব্বা বলতেন আমি বড় হলে তিনি সঙ্গে করে স্টিমারে চড়াবেন এবং ঢাকা নিয়ে যাবেন।

এ ইচ্ছাটাই আমাকে অস্থির করে তুলেছিল, কবে স্টিমারে চড়বো। অবশেষে চাকরি প্রার্থী আটজন রওনা দিলাম ঢাকার উদ্দেশ্যে। ১৯৮৯ সালের ২৯ এপৃল দলের সবচেয়ে কনিষ্ঠ সদস্য বলে বড় ভাইয়েরা আমাকে বেশ স্নেহ করেছিলেন। আমাদের নাইট কোচটি নগরবাড়ি যাওয়ার আগেই চাকা পাংচার হয়ে গেলে সেটি মেরামত করতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগে। আমার আর তর সইছিল না কখন স্টিমারে উঠবো।

ঘাটে পৌছে শুনলাম পাচ মিনিট আগে ফেরিটি ছেড়েছে। নদীর দিকে তাকিয়ে দেখি একটি চার তলা বাড়ি যেন আলো জ্বেলে নদীর বুকে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে। আমার আজীবন ধারণার সঙ্গে স্টিমারের বাস্তব চিত্র কিছুতেই এক করতে পারলাম না।

অবশেষে বাস থেকে নেমে পায়চারি করছি। ত্রিশ পয়ত্রিশ মিনিট পর সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়লো এবং বাসগুলো সামনের দিকে এগোতে লাগলো। আমাদের বাসটিও অনেক কসরত করে ফেরিতে উঠলো। জীবনে প্রথম স্টিমারে উঠতে পেরে নিজেকে গর্বিত মনে হচ্ছিল। সারাক্ষণ স্টিমারের উপর নিচে, ইঞ্জিন রুম সব দেখতে লাগলাম এবং এতো কলকবজা দেখে ভিরমি খাবার জো হলো।

অবশেষে প্রপেলারের নিদারুণ আক্রোশে নদীর জলে যেন ঝড় উঠলো এবং ফেরি চলতে লাগলো। নদীর মাঝামাঝি যখন ফেরি চলছে তখন প্রবল বেগে বাতাস বইছিল। ভাবলাম, এ রকম বাতাস বুঝি শুধু ফেরিতেই পাওয়া যায়। আরিচায় স্টিমার যখন নোঙ্গর করলো তখনকার যে দৃশ্য আমার চোখে পড়লো শুধু প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া আর কারো পক্ষেই সেসব দৃশ্যের পুরো বর্ণনা দেয়া সম্ভব নয়।

ওই রাতের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ার হাজার হাজার মানুষ, গৃহপালিত পশুর আহত ও নিহত নিষ্পন্দন মরদেহের সারি, বাস–ট্রাক সব খেলনা গাড়ির মতো রাস্তার পাশে দুমড়ে–মুচড়ে গেছে। শতাধিক অ্যাম্বুলেন্স আহতদের চিকিৎসার জন্য ঢাকায় এবং মানিকগঞ্জে নিয়ে যাচ্ছে। ঢাকার সমস্ত হাসপাতাল আর ক্লিনিকে রোগী ভরে গেছে। মহান আল্লাহর রহমতে আজও বেচে আছি। না হলে আগের ফেরি ধরলে কি যে হতো তা আল্লাহই জানে।

এ রকম ঘটনা জীবনে প্রথমে দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলাম। এবং জীবনের প্রথম স্টিমারে চড়ে নৌ ভ্রমণের স্মৃতি অন্তরে স্থায়ী দাগ কেটে আছে।

বদরগঞ্জ, রংপুর থেকে

রিলিফ ওয়ার্ক

- সেলিম রেজা

২০০১ সাল রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়া, আকাশে মেঘের ছিটেফোটা নেই। কিন্তু আমরা দাড়িয়ে আছি পানির ওপর। নদী, পুকুর বা সমুদ্রের পানি নয়, বন্যার পানি। আমরা চারজন বুক সমান পানিতে, নৌকা ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে চলেছি কলারোয়া উপজেলার হাইওয়ে সড়কের দিকে। এ সড়কের দুপাশ দিয়ে এখন বসবাস করছে শ শ গৃহহীন পরিবার। আমাদের নৌকায়ও আছে তেমনি একটি পরিবার। একজন বৃদ্ধা, শিশু ও একজন মহিলা আর তাদের সংসারের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। এবং এ পরিবারের কর্তাব্যক্তিটি তাদের হালের বলদ দুটি তাড়িয়ে নিয়ে আসছে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে।

তিন দিন আগে প্রচণ্ড বর্ষণ হয়েছিল। সেই বর্ষণের পর থেকেই এ ভয়াবহ দুর্দশা। অবশ্য পানি আসছে ইনডিয়া থেকে, ইনডিয়ার সীমান্তবর্তী গ্রামগুলো বেনাপোল থেকে শুরু করে পানি দ্রুত গতিতে বাংলাদেশের

ভেতরের দিকে ঢুকতে শুরু করে। আশপাশে দুই দশ মাইলের ভেতরে কোনো অঞ্চল এখনো ডোবেনি এ রকম এলাকার লোকজন রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছে। কিন্তু অর্ধেক রাতে বা সকালে উঠে দেখে খাটের নিচে পানি বা যারা মেঝেতে ঘুমায়, পানির স্পর্শে ঘুম ভেঙেছে। বন্যায় বেনাপোল থেকে সাতক্ষীরা পর্যন্ত সমস্ত সীমান্তবর্তী এলাকাসহ সীমান্ত লাইনের আশপাশের পচিশ ত্রিশটি করে গ্রাম ভাসিয়ে নিয়ে গেল দুদিনের ভেতরে।

আমরা যারা ঢাকায় পড়াশোনা করি এ রকম বেশ কয়েকজন মিলে ঠিক করলাম এলাকায় গিয়ে অসহায় মানুষের পাশে দাড়াবো। ব্যস, সিদ্ধান্ত মতো সবাই ঢাকা ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম সাতক্ষীরার উদ্দেশ্যে। ছয় ঘণ্টার পথ প্রায় বারো ঘণ্টায় অনেক কষ্ট করে বাড়ি পৌছালাম। তার পরদিন সকালে আমরা চার বন্ধু মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম বন্যা প্লাবিত অঞ্চলে এখনো যেসব মানুষ আটকা পড়ে আছে তাদেরকে উদ্ধার করবো। কাজে নেমে পড়লাম। কিন্তু এ জন্য সর্ব প্রথম প্রয়োজন একখানা ছোটখাটো নৌকা।

আমাদের এলাকায় নৌকা কিনতে পাওয়া যায় না। আমার তেইশ বছরের জীবনে প্রথম দেখলাম এই এলাকায় বন্যা হতে। উচু এলাকা হওয়ায় বর্ষাকালেও আমাদের নৌকার প্রয়োজন হয় না। আর নৌকা চলার মতো নদী বলতে একমাত্র কপোতাক্ষ নদ। আমরা চারজন মিলে গেলাম আমাদের হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে।

তিনি আমাদের সব কথা শুনে নিয়ে গেলেন থানা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে।

থানা নির্বাহী কর্মকর্তা আমাদের আগ্রহ দেখে বিনা মূল্যে একটা নৌকার ব্যবস্থা করে দিলেন।

আমরা সেদিন থেকেই বেরিয়ে পড়লাম উদ্ধার কাজে। নৌকা চালাতে গিয়ে দেখলাম আমরা কেউই নৌকা চালাতে জানি না। প্রথম দিন নৌকা ঠেলে ঠেলে এক বৃদ্ধাকে তার দুইটা মুরগিসহ উদ্ধার করে নিয়ে এলাম। তার এক ছেলে কাজের সন্ধানে বাড়ি থেকে এক সপ্তাহ আগে বের হয়েছে, এখনো ফেরেনি। বৃদ্ধা এখন কোথায় যাবেন, কোথায় থাকবেন সে চিন্তায় অস্থির। আগে থেকেই ভর্তি হয়ে থাকা স্কুলের এক কোণায় জায়গা করে দিলাম আর রিলিফ কর্মীদের বলে তার জন্য প্রতিদিন কিছু খাবারের ব্যবস্থা করে দিলাম।

দ্বিতীয় দিন থেকে নৌকা চালানোর জন্য লম্বা বাশের লগি ব্যবহার করতাম।

বন্যার চতুর্থ দিনে আমরা সামান্য কিছু খাবার নিয়ে উপজেলা সদর থেকে ছয় কিলোমিটার ভেতরে চন্দনপুর গ্রামে গেলাম। এ অঞ্চল আজ তিন দিন ধরে পানির নিচে। ঘরবাড়ি সব তলিয়ে গেছে, কোনো রকমে চালগুলো ভেসে আছে। প্রায় সাত ফিট পানি এ অঞ্চলে। চালের ওপর আর গাছের ডালে শুধু মুরগির আবাসস্থল। এক চালের ওপর দুটো ছাগলের বাচ্চা দেখলাম। এলাকায় কোনো লোকজন নেই। সবাই ঘরবাড়ি ছেড়ে ডাঙার দিকে চলে গেছে।

আমরা ফিরে আসার সময় যে গ্রামে উদ্ধার কাজ চলছিল সেখান থেকে দুই পরিবারের তিনজন শিশু, দুইজন মহিলা, একজন বৃদ্ধা আর তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আমাদের নৌকায় উঠিয়ে নিলাম। এ অঞ্চলে প্রায় চার ফিটের মতো পানি। আমরা দুইজন নৌকা থেকে নেমে পরিবারের অন্য তিনজন পুরুষ সদস্যের সঙ্গে হাটতে হাটতে এগিয়ে চললাম।

বেশ কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর একটা জটলা দেখলাম, এগিয়ে গিয়ে শুনি সামনে একটা বাধ ছিল সেটা ভেঙে যাওয়ায় পানিতে প্রচণ্ড স্রোত হয়ে গিয়েছে। সে জন্য কেউ পার হতে পারছে না। আমরা নৌকা একটা গাছের সঙ্গে বেধে রেখে এগিয়ে গেলাম কিভাবে পার হওয়া যায় দেখতে।

বাধের দুপাশেই দুটো গাছ ছিল। নৌকা থেকে লম্বা নাইলনের দড়ি এনে আমার কোমরে বাধলাম, আরেক মাথা বাধলাম এপাশের গাছে। তারপরে রিস্ক নিয়ে এগিয়ে গেলাম স্রোতের দিকে। ডুবতে ডুবতে কোনো রকমে পার হলাম। কোমর থেকে দড়ি খুলে টাইট করে বেধে দিলাম অন্য পাশের গাছে। এরপর যে পার হচ্ছে তার কোমরে দড়ি বেধে টানা দেয়া দড়ির সঙ্গে ফোসকা গেরো দিয়ে দেয়া হচ্ছে যাতে কেউ তলিয়ে যেতে না পারে।

এভাবে অনেক কষ্টে সবাইকে পার করা হলো। কিন্তু নৌকা কোনোভাবে এ পথে পার করা সম্ভব না। আমরা চার বন্ধু সেদিন প্রায় দশ মাইল ঘুরপথে নৌকা নিয়ে এসেছি। সারা দিনের পরিশ্রমে ক্ষুধার্ত সবাই। নৌকা ঘাটে তালা দিয়ে যখন বাড়ির পথ ধরেছি তখন রাত প্রায় দশটা।

আমরা চারজন হেটে হেটে বাড়ির দিকে যাচ্ছি। হঠাৎ কান্নার শব্দে আমরা থমকে দাড়ালাম। ষাট পয়ষট্টি বছরের এক বৃদ্ধ পথের পাশে বসে কাদছেন। আমরা এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে? ক্ষিধে পেয়েছে, খাননি কিছু?

তিনি জানালেন খেয়েছেন। ক্ষুধার্ত নন।

তাহলে কাউকে হারিয়ে ফেলেছেন?

তার উত্তর তিনি কাউকে হারাননি।

থাকার জায়গা আছে নাকি জিজ্ঞাসা করায় তিনি জানালেন, আছে।

তখন আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি তাহলে কাদছেন কেন?

তিনি বললেন, বাবা, সবাই এসে খাবার দিয়ে যায়। কিন্তু আজ সকাল থেকে একটাও বিড়ি খাইনি। বড্ড বিড়ির নেশায় পাইছে। কিন্তু কাছে একটা টাকাও নেই যে বিড়ি কিনে খাবো। তাই কান্দি।

পলিব্যাগে মোড়ানো মানিব্যাগ বের করে দশ টাকা চাচার হাতে দিয়ে আমরা হাটতে থাকলাম।

মিরপুর, ঢাকা থেকে
sreza_writeme@yahoo.com

খেয়া পারাপার

– নাছরিন

তখন ক্লাস থৃ–তে কিংবা ফোরে পড়ি। কয়েকদিনের ছুটিতে আম্মার সঙ্গে আমার নানাবাড়ি বেড়াতে গেলাম। নানাবাড়িতে যেতে হলে নদীতে খেয়া পার হতে হয়। তার মানে আমাদের পাশের গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে নদী। নদীর এক পারে আমাদের বাড়ি, আরেক পারে নানার বাড়ি।

নানার বাড়ি দুই দিন বেড়ানোর পর তৃতীয় দিন সকালে আম্মা বললেন, লিটনকে সঙ্গে নিয়ে যাবো। এখন থেকে লিটন আমাদের বাড়িতে থাকবে।

আমরা দুই বোন বাড়িতে থাকি। আমার এক ভাই, সে ঢাকায় পড়াশোনা করে। তাই (আমার মামাতো ভাই) লিটনভাই আমাদের বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করবেন এবং আমাদের দুই বোনকে পড়ালেখার ব্যাপারে সাহায্য করবেন। লিটনভাই সে সময় ক্লাস নাইনে পড়েন আমাদের পাশের গ্রামের স্কুলে। আমাদের বাড়ি থেকে তার স্কুল কাছে এবং পড়ালেখার যথেষ্ট সময় পাবেন এই ভেবে তিনি কোনো আপত্তি করলেন না।

বিকেলবেলা আমরা রওনা হলাম আমাদের বাড়ির উদ্দেশ্যে। রাস্তাঘাট তেমন ভালো না। তাই হেটেই আসতে হয়। এক ঘণ্টা সময় লাগে নানার বাড়ি থেকে আমাদের বাড়িতে আসতে। সেদিন ছিল বুধবার। শনিবার এবং বুধবার নদীর এপারে হাট বসে। আমরা বিকেলবেলা রওনা হওয়াতে খেয়াঘাটে এসে অনেক লোকজনের ভিড় দেখতে পেলাম। কেউ হাটে যাচ্ছে আবার কেউ বাজার করে হাট থেকে ফিরছে। নৌকার মাঝি দুই তিনবার খেয়া পারাপার করার পর আমরা নৌকাতে উঠলাম।

নৌকাটি ছেড়ে দেয়া অবস্থায় আরো কয়েকজন দৌড়ে নৌকায় উঠলেন। সেখানে ছিলেন আমাদের গ্রামের দূরসম্পর্কের এক কাকা। তাকে সবাই জাম্বু আরিফ বলে ডাকে। আসলেই তিনি দেখতে জাম্বুর মতো। তখন সবেমাত্র এসএসসি দেবেন। তার সঙ্গে আরেক বন্ধু।

আম্মা তাদের নৌকায় ওঠা দেখে বললেন, আরিফ তো নৌকায় উঠলো, এবার নৌকা না ডুবলেই হলো।

আম্মার এ কথা শুনে অনেকেই মিটমিট করে হাসলো।

কিন্তু এতে কাকা কোনো রাগ করলেন না। কারণ সম্পর্কে তিনি আমার মায়ের দেবর হন। তাছাড়া আম্মা প্রায় সময়ই তার সঙ্গে তামাশা করেন।

মা এ কথা বলার কিছুক্ষণ পর মাঝখানে নৌকা এসে শুধু নৌকা একবার এদিক, একবার ওদিক কাত হতে লাগলো। এ রকম অবস্থায় নৌকা কিছুক্ষণ চলার পর সত্যি সত্যি নৌকা ডুবতে আরম্ভ করলো। আমরা সবাই নৌকায় বসা অবস্থায় ছিলাম। নৌকাতে পানি ওঠা দেখে আমি উঠে দাড়াই। কিন্তু কি করবো ভাবতে পারছি না। আমার আম্মা নৌকাতে বসেই আছেন। কেননা তার হাতে দুটি কবুতরের বাচ্চা। মামাতো ভাইয়ের হাতে একটি কাঠাল। আমার নানা এগুলো আসার সময় দিয়ে দিয়েছেন। তারা এগুলো নিয়ে নৌকা ভর্তি পানিতেই বসে আছেন।

সবাই চিৎকার শুরু করে দিয়েছে। কেউ কেউ নৌকা থেকে লাফিয়ে নামছে। যারা সাতার জানে তারা সাতরিয়ে পাড়ে উঠছেন। কিন্তু আমি তো সাতার ভালো মতো জানি না। যাও একটু জানি তা ভয়ে ভুলে গেছি। আমি দাড়িয়েই আছি, কি করবো ভাবতেই পারছি না। আম্মাও আমাকে কিছু বলছেন না।

আমাদের এ অবস্থা দেখে ওপার থেকে আমার এক বান্ধবীর মামা সাতরিয়ে এসে আমাকে পাড়ে নিয়ে গেলেন। সবাই নৌকা থেকে নেমে গেলে পুনরায় নৌকা আবার ভেসে উঠলো। এদিকে আমার আম্মা ও মামাতো ভাই তারা নৌকাতেই ছিলেন। এবং কবুতরের বাচ্চাগুলো পানির নিচেই ধরে বসে ছিলেন। কারো পটল, বেগুন, কাঠাল আবার চাল-ডাল ভেসে গেল। এক পিচ্চি মেয়েকে তার বাবা কাঠাল কিনে বাড়ি পাঠিয়েছেন, সে কাঠালও ভেসে গেল। মেয়েটির সে কি কান্না!

আমরা এপারে আমার এক চাচার বাড়িতে উঠে কাপড়-চোপড় চিপে বাড়িতে রওনা হলাম। ইতিমধ্যে আমাদের গ্রামের সবাই এ দুর্ঘটনার কথা জেনে গেছে। আমি সত্যি খুব ভয় পেয়েছিলাম।

পরদিন আমাকে পানি পড়া খাওয়ানো হয়েছিল। আমার যে বান্ধবীর মামা আমাকে উপকার করেছিলেন এখন তাকে দেখলে আমি লজ্জা পাই। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার ভাষা খুজে পাই না।

বছরে দুই একবার গ্রামে যাই, তার সঙ্গে দেখা হলে কথা বলি না। বরং মাথা নিচু করে তার সামনে দিয়ে চলে যাই। জানি না তিনি আমাকে অকৃতজ্ঞ ভাবেন কি না। কিন্তু না, আমি অকৃতজ্ঞ নই। তার উপকারের কথা কোনোদিন ভুলবো না। আজ নানা, নানি নেই তাই আর সেই খেয়া পারাপার হতে হয় না।

মধ্য বাড্ডা, ঢাকা থেকে

অখেলোয়াড়

– নেয়ামত মিলন

শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া থানাধীন চন্ডিপুর লঞ্চঘাট। ঢাকার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ মূলত চন্ডিপুর-ঢাকা নৌপথেই হয়ে থাকে। অন্যান্য দিনের মতোই সেদিনও ঢাকা যাবো বলে লঞ্চে উঠেছি। রাত প্রায় সাড়ে নয়টায় আমাদের লঞ্চটি চন্ডিপুর ছেড়ে সুরেশ্বর হয়ে ঢাকার পথে যাত্রা শুরু করলো।

প্রায় সত্তর আশি কিলোমিটার পথ। স্বাভাবিক গতিতে চললে মাঝ রাতেই সদরঘাট পৌছানো যায়। কিন্তু এতো রাতে ঘাটে লঞ্চ ভিড়িয়ে রেখে ঘুমন্ত যাত্রীসহ লঞ্চটিকে পাহারা দেয়া কঠিন। তাই নানান ঝক্কিঝামেলা এড়াতে এ পথের লঞ্চগুলো টিমেতালে চলে রাতটা নদীতেই কাটিয়ে দিয়ে। প্রায় ভোর রাতে সাধারণত ঘাটে ভিড়ে থাকে।

লঞ্চের দোতলায় উঠে ডেকের যাত্রীদের বিছানায় একটু আশ্রয় পাওয়া যায় কি না সে চেষ্টা চালাতে লাগলাম। ডেকের যাত্রীরা যার যার মতো শুয়ে-বসে কাটানোর ব্যবস্থা করছে। কোথাও কোথাও ঘুমানোর চেয়ে খেলাকে শ্রেয় মনে করে বাতির হালকা আলোয় তাশ খেলার আয়োজন চলছে।

আমি সম্ভাব্য বিছানায় কাছে গিয়ে খোজখবর নিতে লাগলাম। বাড়তি জায়গা হবে কি না, একা মানুষ একটু বসা যাবে কিনা ইত্যাদি।

কেউ বলছে লোক আছে, জায়গা হবে না অন্যদিকে চেষ্টা করেন। কেউ আবার অতোটুকু জায়গায় নিজের শোয়া সম্ভব হবে কি না তাতেই সন্দেহ পোষণ করছে।

বিভিন্ন বিছানা থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে যখন প্রথমে বসা, তারপর শুয়ে রাতটা পার করার মনোবাসনা ত্যাগ করার উপক্রম ঠিক তখনই দূরের একটা বিছানা থেকে কয়েকজন একত্রে ডেকে উঠলো, আসেন ভাই বসেন। একই এলাকার লোক, অথচ আপনি জায়গা পাবেন না, এটা কি হয়?

আপনাদের অশেষ দয়া বলতে বলতে কোনো রকমে বিছানার এক কোণায় বসলাম।

আমাকে বসতে দিয়ে লোকগুলো চরম আনন্দিত বলে মনে হলো। মনে হচ্ছে, আমি অনুগ্রহ করে বসে তাদের মাথা থেকে বিরাট চিন্তার বোঝা নামিয়ে দিয়েছি।

উঠেছেন কোথা থেকে? একজন জানতে চাইলো।

চন্ডিপুর থেকে। একটু সহজ হয়ে বললাম।

আমরা পঞ্চপল্লি থেকে এসে সেই বিকেলে বিছানা করে বসে আছি। বুঝতেই পারছেন, বিকল্প মাধ্যম না থাকায় আমাদের এলাকার লোকজনকে লঞ্চঘাট পর্যন্ত আসতে বেশি কষ্ট করতে হয়।

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে একাত্মতা প্রকাশ করে তাদের একজন হওয়ার চেষ্টা করলাম।

কথা বলার ফাকে একজন তার ব্যাগের সাইড পকেট হাতিয়ে কিছু একটা খুজতে লাগলো। মনে হচ্ছে, সময় মতো তা হাতের নাগালে না পেয়ে তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে। অবশেষে পাইছি বলে একটা সানন্দ চিৎকার দিয়ে তা সবার সামনে বিছানার মাঝখানে রাখলো।

জিনিসটা দেখে তো আমার চোখ ছানাবড়া। চারদিকে তাকিয়ে গুণে দেখলাম আমাকে নিয়েই বিছানায় আমরা মোট চারজন। বুঝতে পারলাম আমাকে আগ্রহ সহকারে ডেকে এনে বসানোর কারণ।

প্যাকেট থেকে তাশগুলো বের করতে করতে লোকটা আমার দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করলো, কোনটা দিয়ে শুরু করবো, টোয়েন্টি নাইন, নাকি শর্ট বৃজ। আপনার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

কি বলছেন! আমি...।

আমার কথা শেষ করার সুযোগ না দিয়ে সহযাত্রীদের একজন পূর্বসূরির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বললো, হ্যা, আপনিই বলুন। আমরা তিনজন তিন রকম বলার চেয়ে আপনি বললেই হবে। শত হলেও আপনি আমাদের অতিথি।

কোনো রকম ঢোক গিলে বললাম, ভাই, আমি এখনো এ খেলা শিখিনি।

বলেন কি? তিনজনের কণ্ঠে একই সঙ্গে হতাশা আর উদ্বেগ ঝরে পড়লো।

আগে কেন বললেন না? আপনি খেলতে পারেন না আবার বিছানায় বসেছেন। প্রথমজন কপালে চোখ তুলে শীতল কণ্ঠে বললো।

আগে তো আমাকে জিজ্ঞাসা করেননি। আমি আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করলাম।

এতো বড় হয়েছেন কি বাতাসে? রাতটাই আমাদের মাটি করে দিলেন। রাগে ফুসছে তৃতীয়জন।

তিনটি লোকের আক্রমণে বিছানার মায়া ছেড়ে আস্তে আস্তে নিজেকে গুটিয়ে নিতে লাগলাম। আয়েশি ভঙ্গিতে যতোটুকু জায়গা গ্রাস করেছিলাম তার দ্বিগুণ ছেড়ে বিছানার এক কোণায় জড়োসড়ো হয়ে রইলাম।

একটা ক্ষোভ মিশ্রিত হতাশা ব্যক্ত করে তারা যার যার মতো পা টান করতে লাগলো।

টের পেলাম পাগুলো আমাকে সাড়াশির মতো তিন দিক থেকে আক্রমণ করছে। শুয়ে থাকা লোকগুলোর পদতলে বসে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলাম। তাশ খেলা না শিখে ভালো ছেলে হওয়ার গৌরব আজ

গ্লানিতে পরিণত হয়েছে। আশ্রয়দাতার কোনো উপকারে আসতে না পেরে নিজের প্রতি শত ধারায় ঘৃণা উৎসরিত হতে থাকলো।

রাত ক্রমেই গভীর হচ্ছে। নিরেট নীরবতার মাঝে কেবল পদ্মার বুক চিরে বয়ে চলা লঞ্চের ইঞ্জিনের শব্দ একটা বিকট ছন্দে কর্ণকুহরে আঘাত করছে। মাঝে মধ্যে ঢেউয়ের এলোপাথাড়ি ঝাপটায় লঞ্চটা থর থর কেপে উঠছে। আমার ঘুমকাতুরে চোখের পাতা কিছুতেই এক হতে পারছে না। অপমান বোধের মাত্রার কাছে ঘুমের অলসতা আজ পরাস্ত। এ অবস্থায় সকলের অজ্ঞাতে বিছানা থেকে উঠে এসে নিচ তলার ক্যান্টিনের বেঞ্চে বসে রাতটা সে যাত্রায় পার করে দিলাম।

মধ্যবাড্ডা, ঢাকা থেকে

ফ্লোরিডাতে

– করিম চৌধুরী

একদিন খুব মন খারাপ ছিল। মন ভালো করার জন্য টিভি দেখলাম ঘণ্টা খানেক। এবিসি (আমেরিকান ব্রডকাস্টিং কর্পরেশন), এনবিসি (ন্যাশনাল ব্রডকাস্টিং কর্পরেশন), সিবিএস (সেন্ট্রাল ব্রডকাস্টিং সার্ভিস), সিএনএন, ফক্স নিউজ চ্যানেল, ডিসকভারি, ওয়েদার চ্যানেল। কোনো চ্যানেলের কোনো প্রোগ্রামই মন ভালো করতে পারলো না। ওয়েদার চ্যানেলে বৃষ্টি হওয়ার কোনো নিউজ নেই।

বৃষ্টিতে ভেজা আমার অনেক পছন্দের অন্যতম। কয়েক বন্ধুকে ফোন করলাম। নিউ ইয়র্ক, ক্যালিফোর্নিয়া, অরল্যান্ডো, মায়ামি, মেরিল্যান্ড, আটলান্টা, পেনসিলভেনিয়া, নিউ জার্সি। না, মন ভালো হলো না। ভাবলাম লং ড্রাইভে যাবো। গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সিডি অন করলাম। নচিকেতার গান শুনলাম। *এই বেশ ভালো আছি...* / তবুও মন ভালো হলো না।

বাসায় ফিরে কমপিউটারে বসলাম। চ্যাট রুমে চ্যাট করলাম। পত্রিকা পড়লাম। হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট বুশকে ইরাক আক্রমণ না করার অনুরোধ করে ই–মেইল করলাম। তারপরও মনের লক্ষণ ভালো দেখা যাচ্ছে না।

ফ্লোরিডায় যে বাসায় থাকতাম তার পাশেই মেক্সিকো উপসাগর *গালফ অফ মেক্সিকো*। বাসা থেকে দশ মিনিটের ড্রাইভ। আকাশ, পাহাড়, সাগর, নদী আমাকে আকর্ষণ করে। চলে গেলাম বিচে। বিচটির নাম *ফোর্ট মায়ার্স বিচ*। হাটু পর্যন্ত পানিতে ডুবিয়ে অনেকক্ষণ সাগরে হাটলাম। প্রচণ্ড ঢেউ। ছলাৎ ছলাৎ পানির শব্দ কানে আসছে। হঠাৎ ক্ষিধে অনুভব করলাম। বৃজ করে সাগরের মাঝে নিয়ে একটা রেস্টুরেন্ট বানানো হয়েছে। ভাসমান রেস্টুরেন্ট। মেরিনেটেড চিকেন, সালাড আর ড্রিংকস খেয়ে চলে গেলাম ফিশিং পিয়ার (Fishing Pier)–এ। সাগরের তীর থেকে বৃজ তৈরি করে প্রায় এক মাইল দূরে সাগরের মাঝে ছাদহীন একটা ঘরের মতো বানানো। এখান থেকে অনেকেই বড়শি দিয়ে মাছ ধরে। এই জায়গাটিকে বলা হয় ফিশিং পিয়ার। আমার মন ভালো হচ্ছে না। কিন্তু আমাকে মন ভালো করতেই হবে যে কোনো মূল্যে।

খালি পায়ে সৈকতের বালি লাথি মারতে মারতে হাটতে লাগলাম। সমুদ্র সৈকতে যখন যাই তখন জুতা খুলে গাড়িতে রেখে যাই এবং শর্টস আর গেঞ্জি পরে যাই। কথাটা উল্লেখ করলাম এ জন্য যে, আমার কিছু বন্ধু প্যান্ট আর জুতা পরে সৈকতে যান। আমি যখন পানিতে নেমে হাটি তখন তারা আফসোস করে।

অনেকক্ষণ হেটে গিয়ে বেশ দূরে দেখলাম সারি সারি স্পিড বোট সাগরে। কাছে গিয়ে দেখলাম বড় সাইনবোর্ডে লেখা Rent a boat... Have a nice time in the sea – *বোট ভাড়া নিন... সমুদ্রে চমৎকার সময় কাটান*। কাউন্টারে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে জানলাম এক ঘণ্টার জন্য বোটের ভাড়া একশ ডলার। পকেটে ক্যাশ টাকা নেই, তাই ক্রেডিট কার্ড দিলাম। ড্রাইভিং লাইসেন্স জমা দিতে হলো। এটা নিয়ম। উল্লেখ্য, আমেরিকায় একে *ড্রাইভারস লাইসেন্স* বলে।

কর্তৃপক্ষ আমাকে জানালো প্রায় সত্তর মাইল যাওয়ার পর (আমেরিকায় কিলোমিটার নয়, মাইল ব্যবহার করা হয়) অনেকগুলো লাল ভাসমান বল দেখবো, এই সীমানার বাইরে যাওয়া যাবে না। লাল বল থেকে পাচ মাইল নোম্যান্স ল্যান্ড। এরপর কিউবার সীমানা। লাল ভাসমান বলের কাছে গিয়ে ভাবলাম আহামরি কি আর হবে! আরেকটু সামনে গেলে হয়তো সাগর থেকে কিউবা দেখতে পাবো। আমি বরাবরই দুরন্ত প্রকৃতির মানুষ। অজানাকে জানা, অদেখাকে দেখার আকর্ষণ আমার চিরকালের।

আমি বিশ্বাস করি Life is an adventure... dare it *জীবন একটা এডভেঞ্চার... সাহস করে এগোনো উচিত।*

লাল বল পেরিয়ে দশ মাইল দূরে যেতেই দেখলাম মাথার ওপর একটা হেলিকপ্টার চক্কর দিচ্ছে। আমি আপন মনে স্পিডবোট চালাচ্ছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই চারদিক থেকে চারটি বড় সাইজের স্পিডবোট আমাকে ঘিরে ফেললো। বোটগুলোর গায়ে লেখা *ইউএস কোস্ট গার্ড।* একেকটি বোটে ছয়জন করে ড্রেসড গার্ড। বুঝলাম ঘটনা খারাপ। কারণ লাল বল। এমনভাবে বোটগুলো আমাকে ঘিরেছে যে আমি থামতে বাধ্য।

বোট থেকেই আমাকে কিছু প্রশ্ন করলো গার্ডেরা। তোমার নাম কি? তুমি কোথায় থাকো? এখানে কেন এসেছো?

উল্লেখ্য, ফিডেল ক্যাস্ট্রোর কিউবার সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক অত্যন্ত খারাপ। ক্যাস্ট্রো প্রতিদিনই আমেরিকাকে ডিপ্লোম্যাটিক ভাষায় গালাগালি করেন।

কোস্ট গার্ডের প্রশ্নের উত্তর দিলাম। সমুদ্রে বোটিং করছি বললাম।

আমাকে খুব ভদ্রভাবে তারা বললো, Just follow us. *আমাদের ফলো করো।*

কোস্ট গার্ডের চারটি স্পিডবোটের পেছনে চললাম। লাল ভাসমান বলের কাছে গিয়ে তারা থামলো।

আমিও।

বিনয়ের সঙ্গে আমাকে বললো, ভবিষ্যতে যখন সমুদ্রে বোটিং করবে তখন যেন কোনো কারণেই এই সীমানা অতিক্রম করবে না। খুব হাসি-খুশি মুখে বললো, You have a nice time in the sea. Relax yourself. *সমুদ্রে আনন্দ করো। রিলাক্স করো।*

আরেক দিনের ঘটনা। নেভাডা রাজ্যে লাস ভেগাসের জুয়ার কথা জানি। কিন্তু সেখানে আমার যাওয়া হয়নি। নিউ জার্সির আটলান্টিক সিটির ক্যাসিনোতে গিয়েছিলাম। লাস ভেগাসের মতোই। ফ্লোরিডা স্টেটের নিয়ম, আইন অনুযায়ী ক্যাশ টাকা দিয়ে জুয়া খেলা ফ্লোরিডায় নিষিদ্ধ যেমনটি লাস ভেগাস বা আটলান্টিক সিটিতে হয়। তবে লটো (লটারি) বা স্ক্র্যাচ (Scratch) লটারি দোকান থেকে কিনে খেলা যায়। দেশে ফেরার কয়েকদিন আগে ভাবলাম লাস ভেগাসের মতো জুয়া খেলবো। আমি জানি ফ্লোরিডায় এমন জুয়া খেলা যায়, তবে ফ্লোরিডা সীমান্তের বাইরে, গভীর সমুদ্রে। ফোর্ট মায়ার্স বিচ থেকে সপ্তাহে দুই দিন বুধবার এবং রবিবার বিকেল পাচটা থেকে ক্যাসিনো ক্রুইজ (Casino Cruise) নামে সমুদ্রে জাহাজ বা শিপ চলে। চার তলা জাহাজ। সবগুলোর গায়ে বড় করে লেখা CASINO CRUISE. আগের দিন ফোন করে বুকিং কনফার্ম করে রাখতে হয়।

জুনিয়র বন্ধু মাসুদকে নিয়ে রবিবার বিকাল সাড়ে পাচটায় ক্রুইজ ঘাটে পৌছাতেই গার্ড এসে গাড়ির দরজা খুলে দিল যেন আমরা ভিআইপি। অবশ্য সবার জন্য এই নিয়ম। গাড়ি থেকে নেমে গাড়ির চাবি গার্ডের কাছে জমা দিতে হলো। ওরাই গাড়ি পার্ক করে রাখবে। একটা ছোট টোকেন দিয়ে দিল, গাড়ির প্রমাণ। জনপ্রতি দশ ডলার দিয়ে টিকেট কিনলাম।

চারটি সিকিউরিটি পোস্ট পেরিয়ে জাহাজে উঠলাম। ডিসেম্বর মাস। কিন্ত ফ্লোরিডার আবহাওয়া অনুযায়ী ঠাণ্ডা নেই। বসন্তকালের মতো আবহাওয়া। ফ্লোরিডাকে তাই বলা হয় সানশাইন স্টেট। জাহাজের চার তলায় লাইভ মিউজিক এবং ড্রিংকিং বার। তিন তলায় রেস্টুরেন্ট, ডিনার খাওয়ার ব্যবস্থা। দোতলা আর নিচ তলায়

জুয়ার আড্ডা। দোতলায় স্লট মেশিনে অর্থাৎ কয়েন দিয়ে মেশিনে জুয়া খেলার ব্যবস্থা। নিচ তলায় তাসের জুয়া।

জাহাজ ছেড়েছে ঠিক সন্ধ্যা ছয়টায়। পাবলিক অ্যাড্রেস সিসটেমে ঘোষণা করা হয়েছে দেড় ঘণ্টা পর জাহাজ নোম্যান্স ল্যান্ড–এ গিয়ে পৌছাবে। তখন খেলা শুরু হবে। খেলা চলবে দেড় ঘণ্টা। আমি ব্যক্তিগতভাবে জুয়া খেলি না এবং জুয়াড়িকে পছন্দও করি না। দেড় ঘণ্টা পর শিপ (Ship) গিয়ে থামলো নোম্যান্স ল্যান্ড–এ। ঘোষণা এলো, আপনারা খেলা শুরু করতে পারেন। হুড়মুড় করে সবাই চলে গেলো দোতলা এবং নিচ তলায়।

আমি গেলাম দোতলায়। বাজেট পাচশ ডলার পর্যন্ত খেলবো স্লট মেশিনে। পঞ্চাশ ডলার খেলতেই পনেরো মিনিটের মধ্যে এক হাজার ডলার লেগে গেল। খেলতে লাগলাম। হঠাৎ জাহাজ নড়তে লাগলো অস্বাভাবিকভাবে। পাবলিক অ্যাড্রেস সিসটেমে ঘোষণা করা হলো আবহাওয়া খুব খারাপ, সমুদ্র উত্তাল, প্রচণ্ড ঢেউ। তবে যাত্রীদের ভয়ের কোনো কারণ নেই। আমরা কোস্ট গার্ড এবং হেলিকপ্টারকে মেসেজ পাঠিয়ে দিয়েছি। যে কোনো দুর্ঘটনায় উদ্ধাকারী বোট এবং হেলিকপ্টার প্রস্তুত আছে। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন।

জেতা এক হাজার ডলার হারলাম। আরো দুইশ ডলার খেলার পর সময় শেষ। ঘোষণা এলো Stop playing. Time is over – খেলা বন্ধ করো। সময় শেষ।

জাহাজ চলতে শুরু করলো। রাত ঠিক এগারোটায় ক্যাসিনো ক্রুইজ ঘাটে এসে থামলো। গাড়ি নিয়ে বাসায় চলে গেলাম। মনটা ভালো হলো।

কুমিল্লা থেকে

Karim-dhk@yahoo.com

বন্ধন

- মোল্লা আবদুর রহিম

বার্জ, কার্গো, লঞ্চ, স্টিমার এবং জাহাজের পর জাহাজে রকমারি আলোর ঝলকে পশুর নদী অপরূপ সাজে সজ্জিত। রাতের মংলার এমন নয়নাভিরাম দৃশ্যে মন যেন হারিয়ে যেতে চাইছে। স্রোতের অনুকূলে অল্পক্ষণের মধ্যেই আমাদের লঞ্চখানি এসে ভিড়লো *আমীর খসরু* জাহাজের গায়ে।

গ্যাং সিড়ি বেয়ে জাহাজে উঠে গেলাম।

জাহাজের ক্যাপটেন ইকবাল হোসাইন মোল্লা নিজে এসে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়ে তার আমন্ত্রিত মেহমানকে নিয়ে গেলেন।

এই তো সেদিনের কথা। অফিসার বটে কিন্তু তখনো ক্যাপটেন হননি ইকবাল। সিমেন্ট বোঝাই জাহাজের রিসিভিং এজেন্ট ও কনসাইনিং হওয়ার তার সঙ্গে পরিচয় হয় এবং অল্প দিনে তা দিল্লিতে তার পরিবার পর্যন্ত সম্পর্ক গড়ায়।

সুইডেনের মলমো–তে অবস্থিত ওয়ার্ল্ড মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী ইকবাল অনেকদিন থেকে ক্যাপটেন হওয়ার প্রতীক্ষায় ছিলেন এবং মংলায় অবস্থানকালে সেই কাঙ্ক্ষিত পদের নিয়োগপত্র পেয়ে যান। ক্যাপটেন হিসেবে যোগদানের পর মংলায় এবারই প্রথম এসেছেন।

রেংগুন থেকে আনা ইউনিসেফ–এর টিম্বার (কাঠ) খালাস করে আজই এক্সপোর্ট লোড শুরু করেছে। জুট রোল, জুট কটন, কার্পেট, ব্যাকিং ক্লথ ইত্যাদি নিয়ে পূর্বের দেশ অস্ট্রেলিয়ার বৃসবেন, ক্যানবেরা, এডিলেইড ও পোর্ট লিংকন ভিড়বে।

ক্যাপটেন বৃজে ঘুরে জাহাজের মাল তোলা দেখছিলাম। এ সময় ডাইনিংয়ে ডাক পড়লো। টেবিল ভর্তি খাবার। তার সঙ্গে যোগ হলো আমার নেয়া মিষ্টান্ন। প্রদর্শনীর মতো সারিবদ্ধভাবে সাজানো খাবারের ঘ্রাণ যেন সমস্ত জাহাজে ছড়িয়ে পড়ছিল। ইকবালের মতো আমিও ভোজন রসিক। কিন্তু কেউ-ই পেটুক নই।

সম্রাট আকবরের নবরত্ন সভার মোল্লা দোপেয়াজু ইকবালদের পূর্ব পুরুষ বিধায় খানদানি শাহী খাবারে আপ্যায়ন সম্ভবত তার মজ্জাগত ঐতিহ্য হয়ে দাড়িয়েছে। সমস্ত জাহাজে খাওয়া-দাওয়া এবং আনন্দের আমেজ বইতে লাগলো। ইকবালের চোখে খুশির চমক। একটু দেরিতে হলেও জলসার আয়োজন করা হলো। নীলাভ আবছা আলোয় গ্লাসে হুইস্কির সোনালি রঙ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল।

চিফ ইঞ্জিনিয়ার, চিফ অফিসার গ্লাস হাতে যখন প্রস্তুত ঠিক তখন যার উদ্দেশ্য আয়োজন তার ইতস্ততায় ক্যাপটেন মৃদু ধমকের সুরে বললেন, দ্বিধাদ্বন্দ আমি সহ্য করতে পারি না। গো এহেড। চিয়ার্স।

এই বস্তু গলা ছুয়ে একবার পেটে পড়লে সব দুঃখ ভুলে মনের ভাব সম্পূর্ণ ব্যক্ততে বোধহয় কেউ পিছিয়ে থাকতে চায় না। সুয়েজ কানাল পার হয়ে ভূমধ্যসাগরে ধীরে ধীরে ঢুকতে বিক্ষুব্ধ তরঙ্গে জাহাজ যেভাবে দোলে সেভাবেই আমার মাথাশুদ্ধ সমস্ত শরীর দুলতে লাগলো। কিন্তু ক্যাপটেন! ক্যাপটেনের মতো শক্ত হাতে হাল ধরে স্থির হয়ে সামনের পথ নিয়ে ভাবছিলেন। ভাবছিলেন তার পরিবার পরিজন নিয়ে। হি ইজ ডেভিড। আমার ছেলে। এটা এলিনা। আমার স্ত্রী।

ভিডিওতে তার স্ত্রী-পুত্রকে দেখিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লেন।

ভিডিও চলছে। তাতে দিল্লির একটি যুক্ত মাজার শরিফে ভক্তদের শ্রদ্ধার্ঘ, মাজার জিয়ারতের দৃশ্য দেখিয়ে জানালেন, এটি কবি হযরত আমীর খসরুর (১২৫৩-১৩২৫ খৃষ্টাব্দ) মাজার। সাড়ে চার লাখের অধিক শ্লোকের রচয়িতা কবি ছিলেন একজন ইসলামের সাধক। অন্য মাজারটি শাহ নিজামউদ্দিন আওলিয়ার এবং তারই গুণধন্য মুরিদ ছিলেন কবি। সুরা ও সঙ্গীতের জলসায় হোক কিংবা সুন্দরীদের চটুল নৃত্যে সবখানে প্রাণ খুলে হাসতেন, মধুর স্বরে নিজে গাইতেন।

আসর কখন ভেঙেছে জানি না। তবে বেলা করে উঠে দেখি ক্যাপটেনের ক্যাবিনে আছি। আড়ম্বর পূর্ণ নাশতা শেষে এবার বিদায়ের পালা। ইকবাল হাত ধরে নিয়ে গেলেন একটা ক্রু ক্যাবিনে। ভেতরে দুটি বানর চুপচাপ বসে আছে। ইকবালকে দেখে স্বভাব সুলভ ভঙ্গিতে দাত বের করে কিচিরমিচির করে চেচাতে লাগলো। ইকবাল একদম কাছে গেলে জোরে হা করে দাত দেখিয়ে চোখের জল ফেলে শব্দ করে কেদে দিল।

ইকবাল তাদের খুব ভালো জানে। তার চোখ ছল ছল করে উঠলো। যদিও ক্যাপটেনকে খুশি করতে অনেক ক্রুই কাজ শেষে এদের দেখাশোনা করতে প্রস্তুত তবুও ইকবাল তার প্রিয় এক ক্রুর কষ্ট লাঘব করতে দুই ঘণ্টা ডিউটি কমিয়ে এদের দেখভাল করতে দিয়েছিলেন। এ দুটো লোকটাকেও খুব ভালোবেসে ফেলেছিলেন। বাদরামির চেয়েও নাকি বেশি কদাচারণ করে কাল রাতে লোকটির মাথায় বসে মূত্র ত্যাগ করায় রাগে, ক্ষোভে চেইন দিয়ে পিটিয়ে বোবা জানোয়ার দুটোর সামনের দুটো করে দাত ভেঙে দিয়েছেন।

এটাই কি সুযোগ দেয়ার প্রতিদান? ক্যাপটেন জিজ্ঞাসা করলেন।

অজানা আশংকায় আমি চিন্তিত।

জাহাজে আমার এক সহোদর কর্মরত এবং ইকবালের খুবই প্রিয়। বানরদের দেখাশোনা তো সে করতো। তাহলে এমন অমানবিক কাজটা কি সে করেছে? আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

ডিউটি শেষে ভাই সরাসরি এখানে এলে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। বানর দুটো তাকে জড়িয়ে যেভাবে আবেগ প্রকাশ করছিল তা দেখে উপস্থিত সকলের চোখ জলে ভরে গেল।

ভাইয়ের নামে মাধব নামের এক ক্রু নিজের ঘটানো অপকীর্তি অবিকল বর্ণনা করে ক্যাপটেনের সঙ্গে আমাদের পারিবারিক বন্ধনে ফাটল ধরাতে সাবোটাজের আশ্রয় নিয়েছিল।

ভাইয়ের প্রতি ক্যাপটেনের আস্থা ও মমত্ব বোধের অবমূল্যায়ন হয়নি তা প্রমাণ হলো। হাসি মুখে ইকবালের কাছে থেকে বিদায় নিতে পেরে ভালো লাগছিল। লঞ্চ পর্যন্ত নেমে বিদায় জানাতে এসে ক্যাপটেন আবারও আমার কৃতার্থ করলেন।

যখন প্রবল স্রোতে আমাদের লঞ্চখানি হেলে-দুলে নদীর বুক চিরে দ্রুত তীরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, যতোক্ষণ দেখা গেল ততোক্ষণ জাহাজের ওপর থেকে আমার ভাই এবং ইকবাল হাতে নেড়ে বিদায় জানাচ্ছিল।

খুলনা থেকে

জিজ্ঞাসা

- মোহাম্মদ মনোয়ারুল ইসলাম

বছর দশেক আগের এক ঘটনা। বরিশাল থেকে রাতের লঞ্চে বরগুনা যাচ্ছি অফিসের কাজে। আমি সিঙ্গল ক্যাবিনে। পাশের ডাবল ক্যাবিনে বয়স বছর চল্লিশের এক পুরুষ এবং পনেরো-ষোল বছর বয়সের একটা মেয়ে। পোশাকে গ্রামীণ সালোয়ার-কামিজ পরনে।

মেয়েটা দেখতে মোটামুটি এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। তাদের মধ্যকার সম্পর্ক কি তা নিয়ে আমার কোনো কৌতূহল হয়নি, বরং একটা জিজ্ঞাসা জন্মেছিল পরে।

ঘটনাটা বলার আগে জানাই যে, এই লঞ্চগুলো মধ্যম মানের। ঢাকা-বরিশাল সরাসরি চলাচলকারী লঞ্চগুলোর মতো উন্নত না। এই ক্যাবিনের মাঝখানের কাঠের বা স্টিলের দেয়ালের উপর ছয় থেকে আট ইঞ্চি পরিমাণ ফাকা।

রাত দশটা নাগাদ হঠাৎ আমার কানে শব্দ আসে।

না না, ছাড়েন, মাকে বলে দেবো... ইত্যাদি।

পরে ধস্তাধস্তি, দেয়ালে ধাক্কা লাগার শব্দ এবং অস্বাভাবিক কিছু শব্দ।

তারপর সব চুপ।

আমার জিজ্ঞাসা, ওই সব মায়ের কাছে কোনো হিসাব মতে ও বিশ্বাসে এসব ঝুকিপূর্ণ পুরুষের সঙ্গে নিজের কিশোরী যুবতী মেয়েকে এই পরিবেশে পাঠান? নাকি সেই বিশ্বাসে যে –

বিশ্বাস কইরা শুইলাম ভাসুরের পাশে
চৈতন্য পাইয়া দেখি অর্ধেক দিছে?

মিরপুর, ঢাকা থেকে

গর্বিত

– ফজলুল করিম খান

আমি তখন অস্ট্রেলিয়া ভ্রমন করছিলাম। সিডনি সিটিতে ভালোবাসা দিবস উপভোগ করার তিন দিন পরের ঘটনা।

সেদিন বিকেলে ইস্ট লেক পার্কের উত্তর দিকে গাছের নিচে বেঞ্চে বসে পাখির খেলা দেখছিলাম। অস্ট্রেলিয়ার প্রত্যেক পার্কে নানান প্রকার অসংখ্য পাখি বাসে করে। কতোগুলো পাখি আমার কাছে এসে খাবারের প্রত্যাশায় বিরক্ত করতে লাগলো।

জেসিকা আমাকে বলে দিয়েছিল যে, কোনো পার্কে গেলে সঙ্গে করে পাখিদের কিছু খাবার নিয়ে যেতে হয়।

আমি পাউরুটি, পটেটো চিপস, বিস্কিট ইত্যাদি নিয়ে এসেছিলাম। পাখিগুলো আমাকে নানানভাবে বিরক্ত শুরু করে দিলে তাদের জন্য আনা খাবার ছড়িয়ে দিতেই পাখিরা হুড়োহুড়ি করে খাবার খেতে লাগলো।

ঠিক সে সময় পেছন দিক দিয়ে জেসিকা এসে আলতোভাবে দুই হাত দিয়ে আমার দুই চোখে ধরলো।

জেসিকার দামি পারফিউমের গন্ধেই বুঝতে পারলাম কে এসেছে। হাত দুটো ধরে বললাম, জেসিকা।

সে খিলখিল করে হাসতে হাসতে আমার পাশে বেঞ্চে বসলো। বসেই সিগারেট ধরালো এবং আরেকটি ধরিয়ে আমার মুখে দিল। সিগারেট খেতে খেতে বললো জেসিকা, কাল সকালে নৌ ভ্রমণে যাবো। ডার্লি হারবার দিয়ে ফেরিতে করে ম্যানলি সি–বিচ দেখাতে যাবো তোমাকে আবার ফিরে আসবো।

বলে রাখছি, প্লেনে পরিচয় হওয়ার পর জেসিকা আমার বন্ধু হয়ে যায় এবং সেই নিজের গাড়ি দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার নানান দর্শনীয় স্থান দেখাতে থাকে।

পরদিন সকাল দশটায় ঘাটে পৌছে দেখি, জেসিকা দুই হাতে দুটি ওয়ানটাইম কাগজের গ্লাসে হোয়াইট কফি নিয়ে আমার প্রতীক্ষায় দাড়িয়ে আছে।

প্রতি আধ ঘণ্টা পর পর টুরিস্টদের নিয়ে নানান দর্শনীয় জায়গায় ফেরি চলাচল করে। আমরা ম্যানলিগামী ফেরিতে উঠে বসলাম।

সিডনি সিটিকে দুই ভাগে ভাগ করেছে ডার্লি হারবার। উত্তর ও দক্ষিণ। এই হারবারের ওপর দিয়ে তৈরি করা হয়েছে আশ্চর্যজনক একটি বৃজ। পাশেই বিশ্ববিখ্যাত অপেরা হাউস। হারবার বৃজ পেছনে ফেলে অপেরা হাউস ডানে রেখে পূর্ব দিকে আমাদের ফেরি ছুটে চলছে। হারবারের টলটলে পানির ছোট ছোট ঢেউ কেটে এগোচ্ছে। দুই পাড়ে টালি দিয়ে তৈরি হাজার হাজার বাড়িঘর ছবির মতো দাড়িয়ে থেকে পর্যটকদের কৌতূহলী দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। টুরিস্ট নিয়ে অসংখ্য স্পিড বোট এদিক–সেদিক চলাচল করছে। অসংখ্য সামুদ্রিক পাখি সিগাল (Seagull) ফেরির পেছনে পেছনে উড়ে আসছে ঝাকে ঝাকে।

কয়েক কিলোমিটার দূরত্ব পাড়ি দিয়ে আমরা ম্যানলি সি–বিচে পৌছে গেলাম। ইনডিয়া মহাসাগরের এই বিস্তীর্ণ সি–বিচ। শ শ অস্ট্রেলিয়ান সুন্দরীরা শুধু প্যান্টি আর ব্রা পরে বিচের বালুবেলায় চিত হয়ে শুয়ে সূর্যস্নান বা সানবাথ করছে। মনে হয় হাজার হাজার সদ্য ফোটা লাল গোলাপ বালুবেলায় সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এই অতুলনীয় দৃশ্য নিজের চোখে না দেখলে অনুভব করা যাবে না। সাগরের নীল অথৈ পানির ওপর দিয়ে টাইগার শার্করা খেলা করছে, একে অন্যকে দৌড়াচ্ছে। সে আরেক বিচিত্র মোহনীয় দৃশ্য।

এবার ফেরার পালা। ফেরার পথে ঘটেছিল অনাঙ্ক্ষিত ঘটনা যার জন্য এই লেখা।

ম্যাগডোনাল্ডস ফাস্ট ফুডের দোকান থেকে বার্গার আর কফি খেয়ে ফেরিতে উঠলাম। মধ্যম গতিতে এগিয়ে চলছে আমাদের ফেরি। এক কিলোমিটার চলার পর অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটলো। খাদ্যের লোভে একটা সিগাল লালায়িত হয়ে ফেরির ভেতরে ঢুকে পড়লো। এক টুরিস্টের হাত থেকে এক টুকরো চিপস ঠোটে নিয়ে বের হয়ে যাবার জন্য ওড়াউড়ি করতে লাগলো। সিগালটার পেছনে পেছনে দৌড়াতে লাগলো একটা সাত আট বছর বয়সের ছেলে। সিগালটা বের হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটা দৌড় থামাতে না পেরে টপ করে হারবারের পানিতে পড়ে গেল।

ছেলেটা যে পাশ দিয়ে পড়ে গেল সে পাশে বসা ছিলাম আমি ও জেসিকা।

ঘটনায় ফেরির সকল যাত্রীরা হতবাক, উদ্বিগ্ন।

দ্রুত পায়ের জুতা দ্রুত খুলে ফেলে ঝাপিয়ে পড়লাম পানিতে। ছেলেটা গভীর পানিতে তলিয়ে যাচ্ছিল। ডুব দিয়ে ছেলেটাকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে পানির ওপরে উঠে এক হাতে সাতার কেটে এগোতে লাগলাম। ততোক্ষণে কিছুদূর চলে যাওয়া ফেরি পেছনে ব্যাক করে আসছে।

দুই দিক থেকে দুটা স্পিড বোট এগিয়ে এসে আমাকে সাহায্য করলো। স্পিড বোটে বসা একটা লোক আমার বুক থেকে ছেলেটাকে তুলে নিল।

আমিও বোটে উঠে বসলাম। ক্লান্তিতে হাপাচ্ছিলাম। তারপর ছেলেটাকে নিয়ে ফেরিতে উঠে এলাম।

ছেলের মা ও বাবা আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। ছেলেকে আমার বুক থেকে ফিরে পেয়ে মা যে কি আনন্দে উদ্বেলিত তা ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না!

আমার ভেজা শরীর থেকে তখনো পানি ঝরে পড়ছিল।

জেসিকা আমাকে জড়িয়ে ধরে গদগদ কণ্ঠে বললো, ইউ আর গ্রেট। ইউ আর এ হিরো। ইউ আর ব্রেভ মাই ফ্রেন্ড। সবাই জোরে হাত তালি দিতে থাকলো। কেউ কেউ শিষ মারলো।

সমস্ত ফেরির যাত্রীদের মধ্যে আনন্দের হিল্লোল উঠলো। যাত্রীদের অনেকেই কাছে এসে আমার প্রশংসা করতে লাগলো।

তাদের প্রশংসা শুনে ভীষণভাবে গর্ব বোধ করতে লাগলাম।

তারা জেসিকার মুখ থেকে আমাকে বাংলাদেশি জেনে সকলেই বাংলাদেশের সুনাম করতে লাগলো।

উদ্ধার করা ছেলেটির নাম ছিল জন। জনের বাবা পিটার বললেন, আমাদের অস্ট্রেলিয়ায় বেশ কিছু বাংলাদেশি আছে। তারা খুবই অমায়িক। তাদের আচরণে অস্ট্রেলিয়াবাসী মুগ্ধ। আজ থেকে বাংলাদেশিদের সুনাম আমিই মানুষের কাছে করবো।

বাংলাদেশের সুনাম শুনে খুব গর্বিত হলাম। ভাবলাম, বিদেশে নিজের দেশের বদনাম না ছড়িয়ে যদি এভাবে সুনাম ছড়াতে পারতাম তাহলে একদিন *গরিব বাংলাদেশ* পৃথিবীর বুকে গর্বের সঙ্গে মাথা উচু করে দাড়াতে পারতো।

নারায়ণগঞ্জ থেকে

অনুভূতিতে সাড়া

– জি.এম জুলফিকার আবদুল্লাহ

আমি শুনছিলাম।

বলছিলেন শুভঙ্কর হালদার।

তখন ১৯৭১।

চারদিকে মৃত্যু, হানাহানি, খুনোখুনি দলীয় ও ব্যক্তিগতভাবে হচ্ছে। পাকবাহিনীর আতংক, রাজাকারসহ অন্যদের অত্যাচার। যেন ওই হিন্দু পল্লি এক নরকখানা। মানুষ গ্রাম ছেড়ে রাতের অন্ধকারে অল্প কিছু সম্বল নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। কে কোথায় যাচ্ছে বোঝা মুশকিল। রাত শেষে দিন কে দিন বাড়িঘর হাহাকার করতে আরম্ভ হলো।

আমিও একদিন আমার স্ত্রী, দুই কন্যা নিয়ে গ্রামের অন্যদের সঙ্গে নদী ঘাটে এলাম। ঘুটঘুটে অন্ধকার। চারদিক ফিশ ফিশ শব্দ। একজনের সহায়তায় এক মাঝির নৌকায় উঠে বসি। ছইহীন নৌকার দুই কিনার দিয়ে আরো কিছু মানুষ, হারিকেনের টিমটিমে আলোয় যা দেখলাম তাতে মনে হলো মানুষগুলো যেন মৃত্যু উপত্যকায় দাড়িয়ে আছে কারো সঙ্গে। কোনো কথা নেই।

মাঝি নৌকা ছাড়লো। স্রোত আর বায়ুর টানে নৌকা বেশ দ্রুতই চলছিল। ভাটির টানে এবং হঠাৎ বাতাস পড়ে যাওয়ায় আমাদের গতি হয়ে পড়ে ধীর। শংকা, শুধুই শংকা। এর মধ্যেও দুই একটি নৌকা মাছ ধরছে।

জেলেরা ডাক দিয়ে জানতে চায়, কে যায় কারা যায়?

আমাদের পাকা মাঝি উত্তর দেয়, এই তো আমি করিম মাঝি।

আবার নিশ্চুপ, নিথর।

আকাশে মেঘ। মাঝে মধ্যে হালকা বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বাতাসও বইছে একটু জোরেই। বড় নদী। এ প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অস্পষ্ট। মিলিটারিদের লঞ্চ, মুক্তিদের নৌকা কিংবা অভাগা জীবনের ভয়ে ভীত যাত্রীদের নৌকা যেন আসন্ন ঝড়ের আভাসে ব্যতিব্যস্ত।

বাতাসের গতি বাড়ছে। ভোর হয়ে আসছে। আজান শোনা যাচ্ছে ক্ষীণস্বরে। আমাদের নৌকা অন্য নদীতে এসে পড়লো। খরস্রোতা নদী, উত্তাল ঢেউ অন্ধকার। অন্ধকার শুধুই অন্ধকার। বাতি নিভে গেছে। শংকিত সবাই। তবুও অন্ধকারেরও যে, আলো থাকে সে রাতে বুঝেছি। আমার দুই কন্যা জড়সড়ো আমার দুই বাহু আষ্টেপৃষ্ঠে ধরে আছে নিশ্চুপ।

স্ত্রীকে বললাম, টাকা–গহনাগুলো ভালো করে কোমরে গুজে রাখো। আরো বলেছিলাম, নদীতে যদি ঝাপ দিতে হয় কিংবা নৌকা উল্টে যায় তাহলে সাতরিয়ে যেদিক পারো উঠে যেও, আমি এদের নিয়ে আসবো।

ইলা আর মিলা। তাদেরকে সান্ত্বনা দিলাম। তারা আমার আদরের সন্তান। বুকের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। বৃষ্টি শুরু হয়েছে। শীত শীত লাগছে। বাচ্চা দুটি কাপছে। করার যেন কিছুই নেই।

হঠাৎ নৌকা উল্টিয়ে গেল। হাহাকার, চিৎকার, কান্না। দিকবিদিক শূন্য দুই বাচ্চা নিয়ে সাতরাতে লাগলাম। কোথায় যাচ্ছি কিছুই বুঝছি না। স্রোত যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে মরণ পারে। বাচ্চাদের চিৎকার করে জড়িয়ে ধরে রাখতে বলি। বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে দুই পায়ে সাতরাতে থাকি। কিন্তু ঝড়–বৃষ্টি, নদীর স্রোত সবই আমাকে এক সময় পরাস্ত করে ফেললো।

অসাড় হয়ে পড়ছে দুই বাহু ও পা মনের অজান্তে, না নিজের বাচার জন্য দুই হাত ঝাড়া দিয়ে যেন ভার মুক্ত হতে চাই! ততোক্ষণ আমার সন্তান আমার ছাড়া বেশ দূরে।

সাতার না জানা পাচ ছয় বছরের দুই মেয়ে চিৎকার দিয়ে শুধু বলছে, বাবা, ডুবে যাচ্ছি, বাচাও।

আমি ধরতে এগিয়ে যাই, তারা ততোই পিছিয়ে যাচ্ছে। স্রোতের টানে তলিয়ে যাচ্ছে ধীরে। বিদ্যুতের আলোয় দেখছি কখনো ভাসছে, কখনো ডুবছে। ধরতে পারিনি তাদের। শুধু একটি কথা বার বার শুনছি, বাবা, ডুবে যাচ্ছি, বাচাও।

আজও সেই শব্দ মাঝে মধ্যে শুনি। তাই কান চেপে ধরি, এভাবে বসে থাকি।

মনে হলো কথাগুলো আমাদের স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক শুভঙ্কর হালদার এক নিঃশ্বাসে বলে ভারমুক্ত হলেন। জমাটবাধা কষ্ট কিছুটা হালকা করলেন। কিন্তু আমাদের চোখ তখন নীরবেই অশ্রুর ধারা বহন করে চলেছে।

তিনি খুব স্বাভাবিকভাবে বললেন, টিফিন শেষ হয়েছে, যান যান, ক্লাসে যান, বাচ্চারা গণ্ডগোল করবে। বলেই তিনি উঠে দাড়ালেন।

বাধ্য হলাম তার সঙ্গে উঠে দাড়াতে এবং সেদিনের মতো ক্লাসে যেতে।

সেদিন ক্লাসে গিয়ে কথা বলতে পারিনি। আজও যখন মনে হয় তখন আমি নিজের মধ্যে নিজে থাকি না।

যশোর থেকে

নামাজ

- এস.এম সালাহউদ্দীন সালু

বাস থেকে দোহাজারি নেমে আছরের নামাজ পড়ে নিলাম। বাস স্টপেজ থেকে দোহাজারি রেল স্টেশন পায়ে চলা পথে প্রায় দশ মিনিট লাগে। আছরের নামাজ পড়ে দ্রুত পায়ে রেল স্টেশন চলে এলাম। এখান থেকে বেবিট্যাকসি আছে লঞ্চ ঘাটে যাওয়ার জন্য। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। তাই তাড়াতাড়ি একটা বেবিট্যাকসিতে উঠে পড়লাম। সন্ধ্যার আগে লঞ্চ ঘাটে পৌছাতে না পারলে আজ শেষ লঞ্চটা পাওয়া যাবে না। দোহাজারি থেকে ধোপাছড়ি যাওয়ার শেষ লঞ্চটা সন্ধ্যার সময় ছাড়ে। এরপর ধোপাছড়ি যাওয়ার আর কোনো লঞ্চ নেই।

যখন লঞ্চ ঘাটে পৌছালাম তখন মাগরিবের আজান দিচ্ছে। বেবিট্যাকসি থেকে নেমে দেখলাম লঞ্চের অনেক যাত্রী বসে আছে লঞ্চের আশায়। বুঝতে পারলাম শেষ লঞ্চটা এখনো আসেনি। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ভাবতে লাগলাম মাগরিবের নামাজটা পড়ে নিই। পাচ রাকাত নামাজ পড়তে কতোক্ষণই বা লাগবে। লঞ্চ এখনো আসেনি। লঞ্চ আসবে, আগত যাত্রীরা নামবে, তারপর যাত্রী উঠবে। এতে যে সময় লাগবে, ততোক্ষণে আমার নামাজ হয়ে যাবে। দেরি করা সমীচীন হবে না। তাই তাড়াতাড়ি নামাজ পড়ার জন্য জায়গা খুজতে লাগলাম। চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখলাম, হায়! নামাজ পড়ার জন্য কোনো জায়গা নেই। আগে এক কোণে বাশের তৈরি একটা ছোটখাটো এবাদতখানা ছিল। সময়ের আঘাতে ভেঙেচুড়ে যাওয়ায় – আর কেউ মেরামত করেনি। বরং খুটি, বেড়া যা ছিল তাও উঠিয়ে নিয়ে গেছে। এখানে যে, কোনো সময় একটা এবাদতখানা ছিল তারও কোনো চিহ্ন নেই।

নদীর পাড়ে বাশের তৈরি জীর্ণ একটা হোটেল আছে। সেখানে গেলাম। ক্যাশের মতো ভাঙা এক বাক্স সামনে নিয়ে বসে আছে এক লোক। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ভাই, এখানে নামাজ পড়ার কোনো জায়গা আছে?

না, এখানে তেমন কোনো জায়গা নেই।

তার কথা শুনে অসহায়ভাবে হোটেলের চারদিকে তাকালাম। দেখলাম হোটেলের এক কোণে মাচানের মতো একটা জায়গা। মাচাটা মাটি থেকে চার পাচ ফিট উপরে। ওই মাচাটাতে নামাজ পড়া যাবে। তবে দাড়িয়ে নয়, বসে পড়তে হবে। কেননা দাড়াতে গেলেই হোটেলের ছাদের সঙ্গে মাথা ঠুকে যাবে। মাচা দেখে লোকটাকে বললাম, ভাই, একটা জায়নামাজ হবে? তাহলে নামাজটা পড়তে পারবো।

লোকটা আমার নামাজ পড়ার কথা শুনে বললো, এখানে জায়গা নেই, কোথায় পড়বেন?

মাচাটা দেখিয়ে বললাম, এখানে পড়া যাবে না?

দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে বললো, ওখানে নামাজ পড়বেন? কিন্তু ওখানে দাড়ানো যাবে না।

বসেই পড়বো না হয়।

আমার এই কথা শুনে সে তার দোকানের ছোট্ট একটা ছেলেকে বললো, এই দৌড়ে বাসায় গিয়ে জায়নামাজটা নিয়ে আয়।

ছেলেটি হোটেলের পেছনের দরজা দিয়ে দৌড়ে বের হয়ে গেল। ইতিমধ্যে হোটেল থেকে বের হয়ে দেখলাম লঞ্চ এসেছে কি না। দেখলাম, না, এখনো লঞ্চ আসেনি।

ধীরে ধীরে অস্থিরতা গ্রাস করতে লাগলো আমাকে। একবার নদীর দিকে তাকাই, আরেকবার হোটেলের পেছনের দরজার দিকে তাকাই। ছেলেটি গিয়েছে তিন কি চার মিনিট হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে কয়েক ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। ভয় লাগছে নামাজ পড়তে পড়তে যদি লঞ্চ এসে যায়? আবার ভাবছি তা হবে না। কেননা এখনো দৃষ্টি সীমানায় লঞ্চটাকে দেখতে পাইনি। লঞ্চ আসবে, পাড়ে ভিড়বে, যাত্রী নামবে, যাত্রী উঠবে। নাহ! ততোক্ষণে আমার নামাজ হয়ে যাবে।

আমার এই আবোল–তাবোল ভাবনার মাঝেই ছেলেটা জায়নামাজ নিয়ে এলো। তাড়াতাড়ি জায়নামাজটা মাচায় বিছিয়ে বসে বসে নামাজ পড়ে নিলাম। নামাজ পড়ে মোনাজাত না করে তাড়াতাড়ি নদীর পাড়ে চলে এলাম। নদীর পাড়ে এসেই আমার চক্ষু চড়ক গাছ। একি! একজন যাত্রীও নেই। লঞ্চ যাত্রী নিয়ে ততোক্ষণে নদীর পাড় থেকে সাত আট গজ দূরে চলে গেছে। তাড়াতাড়ি দৌড়ে নদীর পাড়ে নিচের দিকে নেমে তারস্বরে চিৎকার করে লঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করতে লাগলাম। সৌভাগ্যবশত লঞ্চের সারেংয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সারেংয়ের হৃদয় আকর্ষণ করতে পারলাম না। এই অচেনা পাড়ে লঞ্চটি আমায় একা ফেলে হারিয়ে গেল নদীর বুকে।

অসহায় হয়ে নদীর জলরাশির দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম। এখন কি করবো? এতো দূর এসে ফিরে যাবো? অবশ্য এছাড়া অন্য কোনো উপায়ও দেখতে পাচ্ছি না।

ভারাক্রান্ত মনে যখন পাড়ের নিচ থেকে উপরের দিকে উঠছি তখন হালকা-পাতলা গড়নের এক ছেলে আমাকে বললো, ভাই, লঞ্চ তো পেলেন না, এখন কি করবেন?

কি আর করবো? ফিরে যাবো।

কোত্থেকে এসেছেন?

চট্টগ্রাম থেকে।

একটা কাজ করেন না, লঞ্চ রিজার্ভ করে চলে যান।

অবাক হয়ে বললাম, রিজার্ভ মানে?

এখান থেকে ধোপাছড়ি পর্যন্ত একটা লঞ্চ নিয়ে আপনি একা যাবেন।

তাই নাকি? তা কতো লাগবে?

কতো আর, দেড়শ কি একশ আশি টাকা নেবে।

শুনে চমকে উঠলাম। সাধারণ ভাড়া যেখানে মাত্র বারো টাকা সেখানে দেড়শ টাকা! ভাবতে লাগলাম কি করা যায়? ভাবতে ভাবতে আবার নিচে নামলাম।এক লঞ্চওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ধোপাছড়ি রিজার্ভ যেতে কতো লাগবে?

আড়াইশ টাকা।

আর কিছু বললাম না। আস্তে আস্তে পাড়ের উপরের দিকে উঠে এলাম। আজ হয়তো ফেরত যেতে হবে। কিন্তু এতো কিছুর পরও আমার মন বলছিল অন্য কিছু। বাস্তব প্রেক্ষাপটে যদিও মনে হচ্ছিল আজ ফেরত যেতে হবে। কিন্তু কেন জানি আমার অবচেতন মন বলছিল, আজ আমি ধোপাছড়ি যাবোই। যদিও জানি না তা কিভাবে সম্ভব?

হতাশ হয়ে নদীর পাড়ে দাড়িয়ে ভাবছি কি করা যায়!

এই সময় সেই ছেলেটি আবার এগিয়ে এলো। বললো, ভাই, আরেকভাবে চেষ্টা করলে যেতে পারবেন।

হতাশা কণ্ঠে বললাম, কিভাবে?

ছেলেটি দুজন লোককে দেখিয়ে বললো, ওই যে দুজন লোক দেখছেন, তারা ফরেস্ট অফিসার। ওদিকে নদীর পাড়ে দাড়ানো লঞ্চটা তাদের। ফরেস্টের রিজার্ভ করা লঞ্চ। তারা এই লঞ্চে করে ধোপাছড়ি যাবে। তাদেরকে আপনার ব্যাপারটা বললে হয়তো নিয়ে যাবে।

কথাটা শুনে মনে আশার সঞ্চার হলো।

ফরেস্টের লোক দুজন স্থানীয় কিছু মানুষের সঙ্গে কি যেন আলাপ করছিল।

তাদের সামনে গিয়ে সালাম দিলাম।

তারা আমার সালাম নিয়ে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো।

বললাম, কিছু মনে করবেন না, পাড়ে দাড়ানো লঞ্চটা কি আপনাদের?

দুজনের মধ্যে একটু বয়স্ক তিনি বললেন, হ্যা।

আপনারা কি ধোপাছড়ি যাবেন?

হ্যা। কিন্তু আপনাকে তো চিনলাম না।

আমাকে চিনবেন না। আমি বিপদে পড়ে আপনাদের কাছে এসেছি। এসেছি চট্টগ্রাম থেকে। এখানে আসার পর মাগরিবের নামাজের সময় হয়েছে বলে নামাজ আদায় করতে গিয়ে ধোপাছড়ি যাওয়ার শেষ লঞ্চটা মিস করেছি। এখন আপনারা যদি সাহায্য করেন তাহলে ধোপাছড়ি যেতে পারবো। তা না হলে চট্টগ্রাম ফেরত যেতে হবে।

ধোপাছড়ি কার কাছে যাবেন?

আমার ভায়রাভাইয়ের পরিচয় দিলাম। আমার ভায়রাভাই আহম্মদ হোসেন ধোপাছড়ি বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। এছাড়া বাংলাদেশের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের একটির ওই ইউনিয়নের গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন। তাই ফরেস্ট অফিসার তাকে চিনতেন।

হ্যা, তার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমরা কিছুক্ষণ পরই রওনা দেবো।

লঞ্চ ধীরে ধীরে চলছে। রাতের অন্ধকারে ছেয়ে গেছে চারদিক। সম্পূর্ণ লঞ্চে আমরা মাত্র তিনজন। লঞ্চের ছাদে মাদুর বিছিয়ে বসে আছি। ফরেস্টের লোক দুজনের মধ্যে একজন অফিসার। খুবই মিশুক এবং অমায়িক। অন্যজন গার্ড।

চাদ এখনো উপরে উঠেনি। পাহাড়ের আড়ালে দাড়িয়ে মাঝে মাঝে উকি দিচ্ছে। আকাশের তারার আবছা আলোয় অন্ধকারের বুকে নদীর পথ চিরে এগিয়ে চলেছে লঞ্চটা। নদীর পানি মাখা ঠাণ্ডা বাতাস শরীরটা জুড়িয়ে দিচ্ছে। ভাবছি বারো টাকা ভাড়া দিয়ে যাত্রীবাহী লঞ্চে গাদাগাদি করে যাওয়ার কথা আমার। কিন্তু নামাজ পড়ার কারণে লঞ্চটা মিস হয়ে যাওয়ায় ফরেস্টের লঞ্চে যাচ্ছি আরামে।

লালখান বাজার, চট্টগ্রাম থেকে

রকেট সার্ভিস

এক সময়ে বরিশাল থেকে ঢাকা যাবার একমাত্র বাহন ছিল লঞ্চ–স্টিমার। এখন যেমন বিভিন্ন কোচ সার্ভিস হয়েছে তখন তা ছিল না। তাছাড়া বরিশাল–ঢাকা পথে রাস্তাও তেমন উন্নত ছিল না।

বরিশাল থেকে প্রতি সন্ধ্যায় তিন চারটি লঞ্চ ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যেতো। তাছাড়া একটি স্টিমারও ঢাকাতে যেতো। তবে নিয়মিত স্টিমার সার্ভিস আর নেই। অসংখ্য লঞ্চ আছে। কিন্তু বছরের ঝড়–বাদলের সময়ে যারা সচেতন যাত্রী তারা কোচেই ঢাকা–বরিশাল যাতায়াত করেন।

বরিশাল–ঢাকা লাইনে নিয়মিত স্টিমার ছাড়াও সপ্তাহে দুদিন স্টিমারের রকেট সার্ভিস ছিল। এটা রাতের বেলা খুলনা থেকে ছেড়ে এসে সকালবেলা বরিশাল পৌছাতো। এবং বরিশাল থেকে সকালবেলা ছেড়ে বিকেলে ঢাকা পৌছাতো। এই স্টিমারগুলোর নাম ছিল, *গাজী, টার্ন, অস্ট্রিচ, লেপচা*। এখন সব পুরনো স্মৃতি। আমাদের জাতীয় জীবন থেকে যেমন অনেক নিরাপত্তা হারিয়ে গেছে তেমনি হারাতে বসেছে সব নিরাপদ বাহন।

তখন স্কুলে পড়ি ঢাকায় আত্মীয়স্বজনদের বাসায় থেকে এই স্টিমার সার্ভিস–এ এবং রকেট সার্ভিসে যাতায়াত করেছি।

এই রকেট সার্ভিস নিয়ে আমার দেখা একটি ঘটনা স্মরণীয় হয়ে আছে। একবার ঢাকা যাবো বলে সকালবেলা বরিশাল থেকে রকেট স্টিমারে উঠেছি। বরিশালের পরিচিত অনেক মুখের সঙ্গে আমার পাড়ার গোলাম নবীকাকাকে দেখলাম।

স্টিমারের দোতলায় সামনের দিকে ফার্স্ট ক্লাস, মাঝে ইন্টারক্লাস এবং স্টিমারের পেছনে দিকে সেকেন্ড ক্লাস ছিল আর দোতলায় মেঝেতে চাদর বিছিয়ে যাত্রীরা যেতেন তাকে বলা হতো *ডেক*।

আমি এবং গোলাম নবীকাকা ইন্টার ক্লাসের যাত্রী। তবে অনেকের মতো আমরা দুজনে সেকেন্ড ক্লাসের রেলিং ধরে দাড়িয়েছিলাম। আরো দাড়িয়েছিলেন সেকেন্ড ক্লাসের অনেক নারী–পুরুষ যাত্রী, তাদের সঙ্গে কয়েকটি ছোট ছেলেমেয়েও ছিল।

স্টিমার সকাল আটটায় বরিশাল থেকে ছেড়ে দিয়েছে। প্রায় এক ঘণ্টা চলার পর স্টিমার তখনো কীর্তনখোলা নদীতে। আমার ও গোলাম নবীকাকার পাশে একটি দম্পতি রেলিং ধরে দাড়িয়েছিলেন। তাদের

সঙ্গে পাচ ছয় বছরের ফুটফুটে একটি বাচ্চা ছেলে। ছেলেটি কিছুটা দুরন্ত প্রকৃতির। অনেকক্ষণ ধরে নবীকাকা আর আমি লক্ষ্য করছিলাম, ছেলেটি রেলিংয়ের প্রথম রডে দাড়িয়ে বার বার ওঠানামা করছে।

ছেলেটির বাবা–মা বার বার করে ওকে ধরে রাখছেন। কিন্তু হঠাৎ এক অসতর্ক মুহূর্তে ছেলেটি একবার রেলিংয়ের প্রথম রডে উঠে পিছল খেয়ে নিচে পড়ে যায়। নিচে মানে একেবারে নদীতে। শুধু ঝপ করে একটি শব্দ শুনতে পেলাম।

নবীকাকা যেন এমন একটি বিপদের আশংকাই করছিলেন। তিনি এক মুহূর্ত দেরি না করে রেলিং টপকে নদীতে ঝাপ দিয়ে পড়লেন।

ওই মুহূর্তের দৃশ্য বর্ণনা করা এখন সম্ভব না। ছেলেটির মা আর্তনাদ করে উঠলেন। তিনিও ঝাপ দিয়ে পড়তে চাইলেন নদীতে। কিন্তু ছেলেটির বাবা মহিলাকে ধরে রাখলেন। চারদিক থেকে যাত্রীরা ছুটে এলো এবং হা–হুতাশ করা ছাড়া তাদের আর কিছুই করার ছিল না। তবে সব জায়গায়ই কিছু বুদ্ধিমান মানুষ নিশ্চয়ই থাকেন। তাদের মধ্যে কয়েকজন দৌড়ে গিয়ে স্টিমারের তিন তলায় সারেংয়ের কাছে গেলেন। স্টিমার থেমে গেল।

স্টিমার থেমে গেলেও গতির জন্য বেশ কিছু দূর এগিয়ে গেল।

আমরা স্টিমারের পেছনের দিক দিয়ে রুদ্ধশ্বাসে দেখছি। হ্যা, অনেক দূর থেকে দেখা যাচ্ছে একজন মানুষ বাচ্চাটিকে দুই হাত দিয়ে উচু করে ধরে আপ্রাণভাবে উপরে ভেসে থাকার চেষ্টা করছেন।

বাচ্চাটির মা ততোক্ষণে জ্ঞান হারিয়েছে।

নবীকাকার কাছ থেকে পরে যা শুনেছি, তিনি স্টিমার থেকে পানিতে ঝাপ দিয়ে পানির গভীরে ডুব দেন এবং আকস্মিকভাবে বাচ্চাটিকে ধরতে সমর্থ হন।

স্টিমারটি ততোক্ষণে ব্যাক গিয়ার দিয়ে নবীকাকার কাছাকাছি এসেছে। নবীকাকা এবং বাচ্চাটি টেনে তোলা হলো। বাচ্চাটির পেটে চাপ দিয়ে পানি বের করা হলো। তার জ্ঞান ফিরে এলো।

বাচ্চাটির মাও ইতিমধ্যে জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন। বাচ্চাকে জড়িয়ে ধরে তিনি হু হু করে কেদে চললেন।

আশপাশে যারা ছিলাম সবার চোখেই পানি।

স্টিমার আবারও ঢাকার উদ্দেশ্যে ভেসে চললো।

কিন্তু নবীকাকা খুবই অবসন্ন হয়ে পড়লেন।

স্টিমারের ফার্স্ট ক্লাসে বিদেশি ব্র্যান্ডের বোতল থেকে নবীকাকাকে একটু পান করালেন।

নবীকাকা সুস্থ বোধ করলেন।

ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! এই ঘটনার দশ বারো বছর পরে নবীকাকার আট বছরের পুত্র সন্তান গ্রামের বাড়িতে পুকুরের পানিতে ডুবে মারা যায়।

সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে কখনো আমার দেখা হলে তাকে জিজ্ঞাসা করবো, প্রভু, তোমার একি প্রতিদান!

নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

ব্রজেন দাসের পরে

- এম. শিহাব উদ্দিন ভূঞা

এখন থেকে প্রায় দুই যুগ আগের কথা। তখন ক্লাস ফাইভে পড়ি। গ্রীষ্মের ছুটিতে নানাবাড়ি বেড়াতে গিয়েছি গাজীপুর জেলার কাপাসিয়ার বেহাইদুয়ার নামে একটি গ্রামে। ঢাকা থেকে একমাত্র মামাও সপরিবারে বাড়িতে এসেছেন।

কম জনবসতিপূর্ণ এ গ্রামটিতে কখনো টিলা, আবার কখনো সমতল ভূমি আবার কখনো বা বিশাল বিল কিংবা জলাশয়। প্রকৃতির এ এক অদ্ভুত খেয়াল। যখন যেটা ইচ্ছা তা-ই করেছে। কেউ বারণ করেনি বা কারো বারণ শোনেনি।

আমরা তিন মামাতো-ফুপাতো ভাই শাহীন, জাহান, তুহিন এবং আমি ভর দুপুরে খেলতে বেরিয়েছি। বয়সে শাহীনভাইয়া বড়, এরপর আমি, তারপর জাহান এবং তুহিন। একজন থেকে আরেকজনের বয়সের ব্যবধান যৎসামন্য। ফলে সম্পর্কটা অম্লমধুর। দুষ্টুমি আমাদের সব সময়ের সঙ্গী। অকারণে মাটিতে লুটিয়ে পড়া, লক্ষ্যহীনভাবে ঢিল ছুড়ে মারা, পরস্পরকে ধাক্কা মারা, হেসে গড়াগড়ি খাওয়া ইত্যকার সব বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড।

বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে গিয়েই মাথায় এলো সামনের ওই বিলটা পাড়ি দেবো। যে কথা সেই কাজ। কিন্তু বিপত্তি বাধলো আমাকে নিয়ে। মুখ কাচুমাচু করে বললাম, আমি সাতার জানি না।

সবাই আমার দিকে যেভাবে তাকালো তাতে আমার ভস্ম হয়ে যাবার কথা। ভাগ্যিস চোখের দৃষ্টিতে আগুন বেরোয় না। তারপর শুরু হলো আমার ওপর ত্রিমুখী আক্রমণ। তাদের শ্রাব্য-অশ্রাব্য কথাগুলোর মর্মার্থ হচ্ছে, আমাকে সঙ্গে আনাটাই ভুল হয়েছে।

কথাটা ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ী ব্রজেন দাস শুনলেও বোধহয় এতোটা উপহাস করতেন না।

আমি দেখতে ছিলাম একেবারে কালো ভূত। শুধু ছিলাম কেন, এখনো সগৌরবে শরীরের কালারটা ধরে রেখেছি আর বুদ্ধিশুদ্ধি ছিল হাটুর বেশ নিচে। ফলে আমি ছিলাম ছোট-বড় সব মহলে উপহাসের পাত্র। আমাকে উপহাস করাটাই ছিল নিয়ম।

নেলসন ম্যানডেলা বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলন না করলে আর ভূপেন বাবু ওই গানটা না গাইলে *আমায় একজন কালো মানুষ দাও, যার রক্ত কালো...* বোধ হয় আমাকে নির্বাসনে দেয়া হতো। বড়দের মতে, আমার মাথার মিশমিশে কালো চুলগুলো ছাড়া ভেতরে নাকি কিছুই নেই, একদম ফাপা। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি নিশ্চিত ছিলেন আমার মেজভাই এবং এখনো নাকি তিনি তার ধারণা পরিবর্তন করার কোনো কারণ খুজে পাননি। লেখাপড়া থেকে শুরু করে সকল কাজে ছিলাম সকলের পেছনে।

আমি সাতার জানি না! তাই বলে এতো বড় আনন্দ তো মাটি করা যায় না। ব্রজেন দাসের মতো টপ সাতারু হতে না পারলেও সাতার আমাকে শিখতেই হবে। কাছেই কাঠাল গাছ থেকে সাতারের উপকরণ হিসেবে ঢাউস সাইজের একটি কাঠাল সংগ্রহ করা হলো। বিলে নামলাম, হাটু পানি। কিছু দূর আগাতেই পানি হাটু-কোমর-গলা-বুক ছাড়িয়ে যখন নাক ছুই ছুই করছে তখন কাঠালটা বুকের নিচে নিয়ে, শরীরের ভর কাঠালের ওপর চাপিয়ে দুই পা এলোপাথাড়ি পানিতে ঝাটিয়ে সাতারের নিষ্ফল চেষ্টা করতে লাগলাম। সামনে এগোলাম, না একই জায়গায় স্থির হয়ে কাঠালটা কেন্দ্রবিন্দু ধরে পা দিয়ে বৃত্ত আকছি ঠিক বুঝতে পারলাম না। মনে হলো এভাবে সাতার কাটার চেয়ে পানিতে তলিয়ে যাওয়া বেশ সহজ। ফিরে আসতে চাইলাম, পারলাম না। দাড়িয়ে মাটির নাগাল পাবার চেষ্টা করলাম। তাও পারলাম না।

সবেচেয়ে বেশি সমস্যা করলো জলজ লতাগুলো। হাতে পায়ে প্যাচিয়ে একাকার। অন্যরা আমার চেয়ে এগিয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাদের বাচাও বাচাও চিৎকারে বুঝতে পারলাম তারাও ভালো সাতার জানে না। নাকে-মুখে পানি ঢুকে আমার আত্মরাম খাচা ছাড়া হবার জোগাড়। ডুবে ডুবে জল খাওয়ার প্রবাদটা ওই মুহূর্তে মনে পড়েছিল কি না তা এখন মনে করতে পারছি না। তবে বেশ মনে আছে জল খাবার পরিমাণটা একেবারে কম ছিল না।

আমাদের এ রকম ত্রাহি মধূসুদন অবস্থা দেখে আজরাইল যখন মিটি মিটি করে হাসছে তখন অনেকটা ভোজবাজির মতো গ্রামের এক রাখাল একটি ডিঙি নৌকা নিয়ে হাজির। পরে জেনেছি গ্রামের লোকজন গরুর খাদ্য হিসেবে বিলের পানিতে মাথা উচিয়ে থাকা জলজ গাছের ডগাগুলো কেটে নিয়ে যায়। এ জন্য প্রায়

প্রত্যেকের বাড়িতেই একটি করে ডিঙি নৌকা থাকে। এমনি একজন যখন ডিঙি নিয়ে তার কাজে নিমগ্ন তখন বাচাও বাচাও চিৎকার শুনে এগিয়ে আসে। দীর্ঘ সময় পার হয়ে গিয়েছে। আজ সেই লোকটির নাম মনে নেই যিনি পরম হিতৈষীর মতো আজরাইলকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে আমাদেরকে তার ছোট নৌকাটিতে নতুন জীবন দিয়েছিলেন।

বিলের প্রায় মাঝখান থেকে নৌকায় করে ডাঙায় আনা হয়েছিল। এ গল্পে আমার নৌপথ ভ্রমণ মূলত এতোটুকুই। সময় লেগেছিল মাত্র তিন চার মিনিট। কিন্তু ওই সময় যদি নৌকা নিয়ে না আসা হতো তবে আজরাইল বোধ হয় একা ফেরত যেতেন না।

পরের ঘটনাগুলো ঘটেছিল অতি দ্রুত। কিভাবে বাড়িতে এলাম, বাড়িতে আনার পর কি রকম হুলস্থুল পড়ে গিয়েছিল সেসব কথা এখন অনেকটা স্বপ্নের মতোই মনে হয়। আজ নদিনের সেই স্মৃতিটা আজো আছে। এই তো সেদিন স্ত্রীর সঙ্গে গল্পচ্ছলে ঘটনাটা বলেছিলাম। সবশেষে বলেছিলাম, সেদিন মরে গেলেই বোধ হয় ভালো ছিল।

তার ঠোট বাকানো হাসি দেখে মনে হলো বলতে চাইছে, একেবারে মন্দ হতো না। স্বামী যদি দেখতে নিগ্রো টাইপের আর বুদ্ধির ঢেকি হয়।

এ রকম চাওয়া স্ত্রীর হতেই পারে।

আহাম্মদবাগ, ঢাকা থেকে

প্রথম পদ্মায়

- মোহাম্মদ সামছুল হুদা সোহেল

১৯৮১ সালের কথা। সে সময় আজকের এই আমি ছিলাম না। তখন সবেমাত্র ছোট ওয়ান পাস করে বড় ওয়ানে উঠেছি। পড়তাম গ্রামের স্কুলে। আমাদের পাশের গ্রামের আজিজপুর প্রাইমারি স্কুলে।

ইতিমধ্যে মেজখালাম্মার বিয়ে ঠিক হলো। এবং যথাসময়ে শুভ বিয়ে সম্পন্ন হলো। ফরিদপুর জেলার সদরপুর থানার অন্তর্গত কাজিডাঙ্গি গ্রামের কাজি বাড়িতে। প্রমত্তা পদ্মা নদী পার হয়ে যেতে হবে ওইখানে যেতে হলে।

বিয়ের পরের দিন অর্থাৎ বৌভাতের দিন ফেরানিতে যারা যাবে সে তালিকায় আমার নামও ছিল। সঙ্গত কারণেই খুশিতে গদ গদ হয়েছিলাম সেদিন। আগেই মামারা বড় একটি নৌকা ভাড়া করে রেখেছিলেন। কেননা নৌকা বিহীন পদ্মা নদী পার হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

যথাসময়ে নানাবাড়ি কাঠালিঘাটা থেকে কার্তিকপুর পদ্মার পাড়ে গিয়ে একে একে সবাই নৌকায় উঠি। অবশ্য এটাই নৌকা ভ্রমণ প্রথম নয়, আমাদের বাড়ি থেকে ইছামতি নদী পার হয়ে হাট-বাজার ও থানা সদরে যেতে হয়। খেয়াঘাটে নৌকায় পার হতে হয়। এছাড়াও বর্ষার সময় নৌকায় ঘুরে বেড়িয়েছি।

যাহোক, মাঝিরা নৌকা ছাড়লো। নৌকা পদ্মার বুকে হেলে-দুলে চলতে লাগলো। আমার পরনে ছিল শাদা পায়জামা আর পাঞ্জাবি। আমার সমবয়সী আরো কয়েকজন ছিল সেদিন। আমরা গল্প করতে লাগলাম।

আমার মন ছোটবেলা থেকেই খুব রোমাঞ্চপ্রিয়। সব সময় নতুন কিছু করার সাধ জাগে। ইচ্ছে হলে আর দেরি করি না। অবশ্য যদি সুযোগ থাকে। উত্তাল পদ্মায় গোসল করতে ইচ্ছে হলো। মনে মনে ভাবলাম, আব্বা কিংবা মামাদের বলি। আবার ভাবলাম, বললে আমাকে দেবে বকা।

এতোটুকু পোলা, উত্তাল পদ্মায় গোসল করতে চায়, সাহস কতো?

ভাবছি, কি করা যায়! কিভাবে পদ্মায় সাতরিয়ে গোসল করা যায়? একটি প্রবাদ আছে, সব কিছু নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। নিয়ত ঠিক থাকলে সে ইচ্ছে পূরণ হয়। আমারও সেদিনের ইচ্ছা পূরণ হয়েছিল।

হঠাৎ অনুভব করলাম, প্রকৃতি আমাকে সাহায্য করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এবং বলছে, এই সোহেল, কয়েক মিনিটের মধ্যেই তোর ইচ্ছে বাস্তবে রূপ নেবে, একটু অপেক্ষা কর। কাউকে বলার দরকার নেই। বললে তোর স্বপ্ন ভেস্তে যাবে।

পাল তোলা বিশাল আকৃতির নৌকাটি আমাদেরকে নিয়ে দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই নিম্নচাপ সৃষ্টি হলো আমার শরীরে। নিম্নচাপের মাত্রা এতো বেশি যে, কাউকে বলার সাহস পেলাম না। করে দিলাম পায়জামার মধ্যেই। তারপর নিজেকে হালকা মনে হলো। আমি তো হালকা হয়ে পরের সেশনের জন্য অপেক্ষা করছি। আর ওইদিকে সমবয়সীরাসহ সবাই ফিসফাস করছে এবং আমাদের পিচ্চি কয়টার দিকে তাকাচ্ছে।

আমাদেরকে বললেন, কে ঘটিয়েছে ঘটনা বল?

আমরা নিরুত্তর। নিরুত্তর হলে কি হবে? প্রকৃতি দোষীকে সাব্যস্ত করে ফেললো। কি আর করা! প্রথমে নিচের অংশ অর্থাৎ পায়জামা খুললো। তারপর পাঞ্জাবি খুলে আমাকে উত্তাল পদ্মার মাঝে নামিয়ে দেয়া হলো। আমার দুই হাত ধরে রেখেছিল দুইজন বয়োজ্যেষ্ঠ। প্রায় আট দশ মিনিট পদ্মায় সাতার কাটি এবং নিজেকে ফ্রেশ করি। পায়জামা পরিষ্কার করে নৌকার ছইয়ের ওপর শুকাতে দেয়া হয়।

যতোক্ষণ পায়জামা না শুকায় ততোক্ষণ শুধু পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে বসেছিলাম। আর আমার ওই অবস্থা দেখে সমবয়সীরা হেসেছিল। অবশ্য তার আগে তাদের আফসোসের কমতি ছিল না। নৌকা থেকে নামার আগেই পায়জামা যথাস্থানে বেধে বিয়ে বাড়িতে গিয়ে মেজখালাম্মার কোলে বসেছিলাম।

এখনো মনে পড়ে, পদ্মার বুকে প্রথম নৌকা ভ্রমণের কাহিনীটি। পদ্মা নদী পার হয়ে মেজখালাম্মার বাড়িতে যেতে হয় বলে খালাম্মার বড় মেয়ের নাম পদ্মা রাখা হয়েছে।

নবাবগঞ্জ, ঢাকা থেকে

লেক ও কৃকে

- আহমেদ জাভেদ

নেপালের পোখারা শহরটি অত্যন্ত মনোরম। চারপাশে পাহাড় ঘেরা ছোট ছিমছাম শহরটি সবাইকে আকর্ষণ করে। আকাশ পরিষ্কার থাকলে স্পষ্টভাবে এভারেস্ট দেখা যায়। ডেভিড ফলস, গুপ্তস্বর মন্দির আর লেক সাইড এই শহরটির প্রধান আকর্ষণ। এ তিনটি কারণেই মূলত ভ্রমণ পিয়াসীরা ওই শহরটিতে যায়।

আপনি যদি কাঠমান্ডু থেকে বাই রোডে পোখারা যান তবে প্রতিটি মুহূর্ত আপনার কাছে অ্যাডভেঞ্চার মনে হবে। রাস্তার পাশে গভীর নদী আর বিপরীত দিকের আকাশ ছোয়া পাহাড় সত্যিই অন্য রকম। শহরটির লেক সাইডটি আসলে পর্যটকদের আবাস স্থল, বেশির ভাগই ইওরোপিয়ান। দুই তিন তলা ছোট ছোট বাংলো টাইপের বাড়িগুলো অনেক সুন্দর করে বানানো ও সাজানো যা হোটেল, রিসোর্ট এবং গেস্ট হাউস নামে পরিচিত। লেকের পাশের রাস্তাটিতে অনেকগুলো রেস্টুরেন্ট, কফি শপ ও দোকান আছে। এসব এন্টিক টাইপের জিনিস দিয়ে সাজানো যা দেখলে শুধু কিনতেই ইচ্ছা করে। লেকের পাড়ে ছোট ছোট ডিঙি নৌকা আছে। ইচ্ছে অনুযায়ী ঘণ্টা চুক্তি ভিত্তিতে ভ্রমণ করা যায়। লেকটির মাঝে একটি ছোট দ্বীপ যা একটি মন্দিরকে কেন্দ্র করে। পূজার জন্য এখানে মানুষের বেশ সমাগম। ডিসেম্বরের এক পড়ন্ত বিকেল বেশ ভালোই কাটিয়েছিলাম ওই লেকটিতে।

গত এপৃলে টুরিস্ট ভিসায় দুবাই আসি। হোটেল থেকে বের হয়ে জানতে পারলাম দুবাই শহরটাকে দুই ভাগে ভাগ করে দিয়েছে দুবাই কৃক (Dubai Creek)। একটির নাম ডায়েরা দুবাই (Deira Dubai) আর অন্য পাশটির নাম বার দুবাই (Bur Dubai)। দুবাই কৃক হলো আরব সাগর থেকে আসা প্রায় এক কিলোমিটার প্রশস্ত ও প্রায় পচিশ ত্রিশ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি নদীর মতো। সমুদ্র থেকে শেষ পর্যন্ত সবটা কৃক পাথর

দিয়ে পাড় বাধানো। তারপর রাস্তা। এবং রাস্তার পাশে আকাশচুম্বী শ শ নান্দনিক ইমারত। এসব ইমারতের বেশ কয়েকটিই বিশ্ব বিখ্যাত হোটেল ও কম্পানির অফিস।

আমিসহ তিনজন আমেরিকান মহিলা এক বাংলাদেশি চালিত ট্রলার ভাড়া করে দুই ঘণ্টা সময় নিয়ে দুবাই কৃক ভ্রমণ করি। দুই পাশে যোগাযোগের জন্য দুটি বৃজ ও একটি টানেল আছে। জানা না থাকলে টানেলের ভেতর দিয়ে যেতে যেমন বোঝা যায় না যে উপরে পানি তেমনি কৃকের ওপর দিয়ে বোটে চড়ে যেতেও বোঝা যায় না যে নিচে কোনো টানেল আছে যা দিয়ে মিনিটে শ শ গাড়ি যাতায়াত করছে।

দুবাই কৃকের মতো জেদ্দাতেও একটি এমন কৃক আছে যা অবহোর নামে পরিচিত। সউদি আরব অনেক রক্ষণশীল হলেও জেদ্দার এই স্থানটি কিছুটা ভিন্ন। উইকএন্ড এবং হলিডে–তে প্রচুর লোকের সমাগম হয় এখানে। বিভিন্ন ধরনের ভ্রমণ তরী, বিশেষ করে ওয়াটার বাইকগুলোর নৈপুণ্য যে কাউকে প্রচুর আনন্দ দেবে। আড়াইশ রিয়াল (তিন হাজার আটশ টাকা) দিয়ে এক ঘণ্টা অগভীর কিন্তু স্বচ্ছ ওই কৃকের ভ্রমণটা কখনো ভোলার নয়।

ঠিকানা বিহীন
ahmedjabed@hotmail.com

চাদনি রাতে

- মোহাম্মদ জীবন রহমান

তখন আমার বয়স আর কতোই বা হবে? পাচ কি ছয়! সবেমাত্র হ্যাফপ্যান্ট ছেড়ে শখ করে লুঙ্গি পরা শুরু করেছি। স্কুলে যাওয়া তখনো পুরোদমে শুরু হয়নি। একদিন যাই তো, তিন দিন ফাকি দিই। যে কয়দিন স্কুলে যাই, তাও আবার স্লেট দিয়ে চাকতি খেলতে খেলতে বাড়ি ফিরি। চাকতি খেলতে গিয়ে স্লেট ভাঙলে বাড়ি ফিরে মাকে বলি,আছাড় খেয়ে ভাঙলে আমার কি দোষ!

সঙ্গীদের কাছ থেকে শুনে মা যা বোঝার বুঝে ফেলেন। দুই একটা ধমক দিয়েই ক্ষান্ত হন। সতর্ক করে দিয়ে বলেন, ভবিষ্যতে ভাঙলে খবর আছে।

কিশোর মন। কে শোনে মার উপদেশ বাণী। চাকতি খেলাও বন্ধ হয় না, স্লেট ভাঙাও শেষ হয় না। শেষে কাঠের স্লেটই হলো নিত্যদিনের সঙ্গী।

স্কুল ফাকির দলে আমি একা ছিলাম না। আরো চার পাচজন। জিকু পালের গোদা, জিকু অবশ্য আমাকে মামু বলেই ডাকে। স্কুল ফাকি দিয়ে বাড়ির পাশ্বর্বর্তী খালে ইচ্ছে মতো ডুবানো, ঘুঘুর বাসার ডিম খোজা, খাল পাড়ের পাকা বীচি কলা চুরি ইত্যাদি নিত্যদিনের কাণ্ড। খালে ডুবাতে ডুবাতেই আমার সাতার শেখা।

তখন শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি হবে। জিকুর বুদ্ধি বললো, মামু, চাদনি রাত, এক কাজ করবো, বাড়ির সামনে ডোঙ্গা বাধা থাকে। আমরা দলের সবাই মিলে রাতে ডোঙ্গায় চড়ে সারা বিল ঘুরবো। বাড়িতে বলা যাবে না। বললে সন্ধ্যার পর বের হতে দেবে না।

পূর্ব পরিকল্পনা মতো দিনে কে কোথায় কই মাছের জাল পাতে আমরা খোজ নিয়েছিলাম।

ডোঙ্গায় চড়ে ঘুরবো আর সবার কই মাছের জাল থেকে ইচ্ছে মতো কই মাছ চুরি করবো। খুব মজা হবে, তাই না!

আমরা সবাই রাজি হলাম।

মাগরিবের আজানের কিছুক্ষণ পর অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা বাড়ির সামনে বাধা দুটি ডোঙ্গা নিয়ে চম্পট। বিশাল বিল। দৈর্ঘ ও প্রস্থে দুই মাইলের কম হবে না। চারদিকে শুধু পানি আর পানি। ভরা বর্ষাকাল। প্রকৃতির এক অপরূপ সৌন্দর্য। মনে হচ্ছিল, কোনো শিল্পীর নিজ হাতে আকা ছবি। আউশ এবং ইরি ধানের ডগা যেন পানির সঙ্গে ছায়াছুয়ি খেলছে। বিধাতার নিজ হাতে আকা ছবি। বার বার মনে হচ্ছিল, আমরা

বোধহয় পথের পাচালির অপু ও দুর্গাদের কেউ। মনের আনন্দে আমরা উচ্ছল। ডোঙ্গা চালাচ্ছি এবং কই মাছের জাল থেকে দুই চারটা করে কই মাছ সংগ্রহ করছি। তিন চার কুড়ি কই মাছ ডোঙ্গায় চড় চড় শব্দ করছে। কখন যে ঘণ্টা দুই ছাড়িয়ে গেছে সেদিকে আমাদের খেয়াল নেই!

ওদিকে বাড়িতে বলে আসিনি। সবাই উদ্বিগ্ন। ইতিমধ্যে বাড়ির চারপাশে খোজাখুজি শুরু হয়েছে। কেউ কাছের বাজারে, কেউ কাছের আত্মীয়ের বাড়িতে, কেউ প্রতিবেশীর বাড়ি। খোজার অন্ত নেই। একজন বাড়ির পাশে দাড়িয়ে জোরে জোরে চিৎকার করে ডাকছে। এক দুইজন নয়, আমরা পাচজন নিখোজ। অনেকের ধারণা, ভূতের কারসাজি নয় তো?

বাড়ির কাছাকাছি ডোঙ্গা আসতেই বাড়ির একজনের ডাক আমার কানে ভেসে এলো এবং আমিও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলাম। খোজাখুজির হই চই আচ করতে পারলাম। অমনি সবার বুক দুরু দুরু করে কাপতে শুরু করলো।

বাড়ির ঘাটে ডোঙ্গা ভিড়তেই সবার বড় বড় দুটি চোখ আমাদের দিকে। মনে হলো, আমরা বোধ হয় কোনো চিড়িয়াখানার জন্তু। কেউ বকাঝকা শুরু করছে আর অন্যরা ডোঙ্গার কই মাছ দেখে হতবাক।

এতো কই মাছ! তোরা কোথায় পেলি!

সবাই কই মাছ ভাগাভাগিতে ব্যস্ত। এবং কই মাছের কারণেই চাদনি রাতের ডোঙ্গা ভ্রমণের শাস্তি থেকে আমরা রেহাই পেয়েছিলাম। সে রাতের কাহিনী ভোলার নয়।

গেন্ডারিয়া, ঢাকা থেকে
domotanaka@yahoo.com

নাচ

– জাফর আহমদ আকাশ

অনেক দিন আগের কথা। নভেম্বর মাস। কি এক কারণে কলেজ ছিল বন্ধ। আমরা কয়েকজন বন্ধু –আমি, হাসান, মামুন, আলমগীর ও বাবুল মিলে সকালবেলা প্রোগ্রাম করলাম, আজ বিকেলে নৌ ভ্রমণে বের হবো।

যে কথা সেই কাজ। নির্দিষ্ট সময়ে সবাই ঘাটে উপস্থিত হলাম। সবাই নৌকায় চেপে বসলাম। মাঝি পানি ভেঙে নৌকা এগিয়ে নিয়ে চলেছে। পেছনে পড়ে রইলো আমাদের গ্রাম। মাথার উপর আকাশ খুব স্বচ্ছ। রোদের তেমন তেজ নেই। দক্ষিণা বাতাস ছুটোছুটি করে খেলছে সারা নদী জুড়ে। মন মাতানো সেই বাতাসে সমস্ত মন–প্রাণ জুড়িয়ে যায়। আমাদের নৌকা খাগাইল পেরিয়ে খোলামোড়ার শেষ প্রান্তে এগিয়ে যাচ্ছে। বুড়িগঙ্গার দুই ধারে শুধু সবুজের সমারোহ।

এক সময় হাসান ফ্লাস্ক থেকে চা পরিবেশন করলো।

আলমগীর বাধা দিয়ে বললো, এখন শেষ করার দরকার কি, সন্ধ্যার পর খাবো।

হাসান বললো, এটি শেষ হোক, সামনে বাজার পড়বে, তখন আবার কিনে নেবো।

চায়ের পর্ব শেষ হতেই মামুন গান গেয়ে উঠলো।

মামুনের গান শেষ হতেই আলমগীর শুরু করে দিল হাসির কৌতুক।

হাসতে হাসতে আমাদের পেটে খিল লেগে যাওয়ার অবস্থা।

আমাদের সব কাজের কাজী বাবুল স্টিলের বোলে পেয়াজ, কাচা মরিচ কাটতে শুরু করে দিয়েছে। পলিথিনে করে সামান্য সরিষার তেলও নিয়ে এসেছে বাবুল। পুরোদমে চলছে মুড়ির ভর্তা বানানোর কাজ। আলুর চপ, পিয়াজু, সিংগারা, মটর মিশিয়ে মুড়ির ভর্তা বানানো শেষ হলো। মুড়ির ভর্তা ঠোঙায় করে মাঝিকে দিল বাবুল।

মাঝি ঠোঙা থেকে মুড়ির ভর্তা মুখে দিয়ে চিবোচ্ছে আর নৌকা বেয়ে যাচ্ছে।

আমরা সবাই ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো ঝাপিয়ে পড়লাম মুড়ির ভর্তার ওপর। মুঠি মুঠি ভরে মুড়ির ভর্তা খাচ্ছি এবং সবার মুখ দিয়ে নানান কথার ফুলঝুরি ঝরে পড়ছে।

আমাদের কান খাড়া হয়ে গেল দূর থেকে ভেসে আসা হিন্দি সিনেমার গান শুনে। আমরা সবাই এদিক–সেদিক তাকাতে লাগলাম কোথা থেকে গান ভেসে আসছে।

হাতের আঙুল দিয়ে সামনে বাড়িয়ে হাসান বললো, আমাদের সামনে যে নৌকা যাচ্ছে সেখান থেকেই মনে হয় গানের শব্দ আসছে।

আমাদের নৌকা থেকে প্রায় সত্তর আশি গজ সামনে একটি নৌকা দেখা যাচ্ছে। তারা হয়তো নৌ ভ্রমণে এসেছে। মাঝিকে বললাম, ওই নৌকার কাছাকাছি নিয়ে যেতে যেন আমরাও গানগুলো উপভোগ করতে পারি।

আমাদের নৌকা এখন সামনের নৌকা থেকে চার পাচ গজ দূরে। আমাদের নৌকা থেকে ওই নৌকার সব কিছুই দেখা যায়। ওই নৌকাতে চারজন ছেলে এবং তিনজন মেয়ে আছে। তাদের বেশভূষায় বোঝা যায় পুরনো ঢাকা থেকে এসেছে। তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে আর চিপস খাচ্ছে।

তাদের মাঝ থেকে একটি মেয়ে দাড়িয়ে পড়লো এবং সবাই মেয়েটিকে জায়গা করে দিল। তারপর শুরু হলো হিন্দি গানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মেয়েটির নাচ।

সমান দূরত্ব বজায় রেখে দুই নৌকা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

আমরাও নৌকায় বসে দেখতে লাগলাম মেয়েটির নাচ।

নাচ শেষ হতেই মামুন চিৎকার দিয়ে উঠলো। ওয়ান মোর! ওয়ান মোর!

মেয়েটি নতুন উদ্যমে শুরু করলো আবার নাচ। বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গিমায় সে নেচে চলেছে।

এই দুই নৌকার কিছুটা দূরত্ব দিয়ে চলে গেল মাল খালাস করা বড় একটি জাহাজ। জাহাজের গতিতে তৈরি হওয়া ঢেউ তেড়ে এলো আমাদের নৌকার দিকে। ঢেউয়ের দাপটে আমাদের নৌকা দুটি শূন্যে উঠে পড়লো। তারপর আছড়ে পড়লো পানিতে।

মেয়েটি ভারসাম্য হারিয়ে ছিটকে পানিতে পড়ে গেল।

ওই নৌকা থেকে শব্দ এলো, বাচাও! বাচাও!

আমার বন্ধুরা এ দৃশ্য দেখে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছি।

মেয়েটি বাচার জন্য প্রাণপণ হাত পা ছুড়ছে।

ব্যাপারটা সিরিয়াসভাবে নিলাম। শরীর থেকে শার্টটা খুলে লুঙ্গিটা কাছা মেরে পানিতে ঝাপিয়ে পড়লাম।

মেয়েটির হাত পা ছোড়া শিথিল হয়ে আসছে।

দ্রুত সাতার কেটে মেয়েটির কাছে গেলাম। মেয়েটি প্রায় ডুবে যাচ্ছিল। তার মাথার চুল ধরে আমাকে এবং মেয়েটিকে পানিতে ভাসিয়ে রাখার চেষ্টা করছি।

মাঝি এবং আমার বন্ধুরা নৌকার পাটাতন দিয়ে নৌকা বেয়ে আমাদেরকে নৌকায় তুললো।

এর মধ্যে ওই নৌকা এসে আমাদের নৌকার সঙ্গে ভিড়লো।

ইতিমধ্যে প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করে দিয়েছি। মেয়েটির পেটে পর পর জোরে কয়েকটি চাপ দেওয়াতে মুখ দিয়ে পানি বের হলো।

ওই নৌকা থেকে কথা শোনা যাচ্ছে, জুইয়ের যদি কিছু হয় তাহলে তার মা–বাবাকে কি জবাব দেবো? এমনিতে তার মা–বাবা আসতে বারণ করেছিল। কিন্তু এখন আমরা কি করবো?

তাদেরকে ধমকের সুরে বাবুল বললো, সাতার জানে না তাহলে এমন রিস্ক নিয়েছে কেন?

সবাই মাথা নিচু করে নিল বাবুলের কথায়।

অনেক চাপাচাপির পর মেয়েটির মধ্যে প্রাণ সঞ্চালন হলো। নতুন চেহারা দেখে ভয় পেয়েছে হয়তো। উঠে বসার চেষ্টা করেই আবার পড়ে গেল।

অনেক চেষ্টার পর জুই খানিকটা সুস্থ হয়ে উঠলো।

ইতিমধ্যে নৌকা দুইটি চরে ভিড়ে গেছে।

জুইয়ের সঙ্গীরা জুইয়ের পাশে এসে দাড়াতেই জুই তার বান্ধবীদের হাত ধরে দাড়লো।

জামা–কাপড় ভিজে থাকায় জুইয়ের শরীরের বিশেষ অংশ দেখা যাচ্ছিল।

হাসানকে আমার শার্টটি দিতে বললাম। হাসানের কাছ থেকে শার্টটি নিয়ে জুইকে পরতে বললাম।

আলমগীর বুঝিয়ে দিল কিভাবে তারা তাদের গন্তব্যে পৌছাবে।

আমাদের কোনো কিছু না বলেই তারা ছুটলো।

মামুন বললো, দেখেছিস তাদের কারবার! আমাদের একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত দিল না।

দৌড়ে জুইয়ের কাছে গিয়ে বললাম, ম্যাডাম আমি গরিব ঘরের ছেলে, নাম আকাশ। পারলে শার্টটা ফেরত দেবেন। আমার গ্রামের নাম রহমতপুর।

ইমামগঞ্জ, ঢাকা থেকে

মৃত্যুপুরী

আমাদের গ্রামে কিংবা শহরের বাড়িতে যাতায়াতের সময় কখনোই নৌপথে যাতায়াত করতে হয় না। ফলে নৌপথ ভ্রমণের খুব ইচ্ছা ছিল। আমার এক আত্মীয়ের বাড়ি ছিল বরিশালে। ওই আত্মীয়ের অনুরোধে বরিশাল বেড়াতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। কেননা বেড়ানো এবং নৌপথ ভ্রমণ দুটোই হবে এক সঙ্গে।

একদিন সন্ধ্যায় আত্মীয় এক ভাইয়ের সঙ্গে সদরঘাট থেকে ক্যাবিন ভাড়া করে লঞ্চে উঠলাম। এক পর্যায়ে লঞ্চ চলতে আরম্ভ করলো। রাত যতোই গভীর হতে লাগলো, পূর্ণিমার চাদ ততোই উজ্জ্বল হতে লাগলো। জ্যোৎস্না রাতের নৌপথ ভ্রমণ উপভোগ করার জন্য ক্যাবিনের বাইরে বারান্দায় ভাইসহ বসে আকাশের তারা গুনছিলাম। ইত্যবসরে অনেকেরই দৃষ্টি পড়ে আমার ওপর।

এর কিছুক্ষণ পর কয়েকজন উঠতি বয়সের সন্ত্রাসীরা আমাদের কাছে এসে বিভিন্ন প্রশ্ন করে। তারা ভেবেছিল আমরা প্রেমিক–প্রেমিকা, অজানা উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাচ্ছি। কিন্তু তাদের মতলব ছিল খারাপ। তারা আমার আত্মীয় ভাইকে বারান্দায় আটকিয়ে রেখে আমাকে নিয়ে ক্যাবিনে যায়। এরপর আমার সব কিছু কেড়ে নেয় সন্ত্রাসীরা।

লঞ্চ সেদিন হয়েছিল ভাসমান মৃত্যুপুরী।

এ ঘটনা কাউকেই বলতে পারছিলাম না। এভাবে লেখার সুযোগ পেয়ে লিখতে বসেছি। ছাপা না হলেও লিখতে পেরে নিজেকে অনেক হালকা মনে করছি। সেদিনের সে মৃত্যুপুরী থেকে ফিরে এসে সারা জীবনের মতো নৌপথ ভ্রমণের শখ মিটে গেছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
মিরপুর, ঢাকা থেকে

ক খ গ ঘ ঙ

– জাহিদ ইকবাল

ক

কখন থেকে ইশরাত–এর জন্য অপেক্ষা করছি, অথচ তার আসার কোনো খবরই নেই। কথা ছিল ১ সেপ্টেম্বরের সকাল নয়টায় নিকুঞ্জের বাগান বাড়িতে আমি তার বা সে আমার জন্য অপেক্ষা করবে। এরপর

দুজনে যাবো আশুলিয়াতে। অথচ এখন বাজে সাড়ে দশটা। সে আসবে না ভেবে হতাশায় যখন বাসায় ফিরছি, পথিমধ্যে রিকশা থেকে দাড়ানোর সংকেত, থামলাম।

রিকশা থেকে ইশরাত নেমে এলো। তাকে দেখে অশান্ত মন আমার চৈতালি চৌচির হলো। অনেক কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারলাম না। তার বক্তব্য শোনার পর নিজকে সংযত করলাম।

রওনা দিলাম আশুলিয়ায়। ভরা বর্ষা মরসুম তখন। আশুলিয়ার দুই কূল উপচে পড়ছে ঢেউয়ের পর ঢেউ। সে এক অন্য রকম ভালো লাগা।

ইশরাত বায়না ধরলো তাকে নৌকায় নিয়ে ঘুরতে হবে।

কি আর করা! একটি নৌকা ঘন্টা হিসেবে ঠিক করে দুজন নৌকায় গিয়ে উঠলাম। দেখলাম নৌকার ভেতরে যেন ছোটখাটো একটি ঘরের অয়োজন। পাটি, কাথা, বিছানা, বালিশ সব রয়েছে তাতে। নৌকার খোলা দুই পাশে চাদর দিয়ে পর্দার মতো টেনে দেয়া হয়েছে যাতে ডেটিং পার্টিদের কোনো রকম অসুবিধা না হয়। আমরা অবশ্য নৌকার সামনের দিকের চাদর সরিয়ে দিয়েছি বর্ষার যৌবনকে খুবই কাছে থেকে নিবিড় করে দেখতে দক্ষিণা বাতাসে বেশ ভালো লাগছিল।

ইশরাত নৌকার সামনের দিকটায় একটু এগিয়ে বর্ষার থই থই পানিতে দুই হাত ভিজিয়ে দুষ্টুমি করছে। হাতে মুখে পানি নিয়ে কুলি করছে এবং বলছে, দেখো জান, কি শীতল আর স্বচ্ছ এই পানি। হঠাৎ ইশরাত শাপলা দেখে আনন্দে চিৎকার করে উঠলো। সে নিজ হাতে শাপলা তুলে আমার হাতে দিয়ে বললো মালা বানিয়ে দিতে।

আমি মালা বানিয়ে তার গলায় পরিয়ে দিলাম।

সে আমার গলায় মালা পরালো না। বললো, আমি একদিনই তোমাকে তোমার গলায় মালা পরাবো। আমার সে মালাই হবে বরণ মালা, মিলন মালা। তুমি আমার ওপর ভরসা রাখো।

বললাম, ভরসা তো অবশ্যই আছে। তারপরও যদি তুমি আমাকে ভুলে গিয়ে অন্য কাউকে বরণ করো, স্মরণ করো তখন আমার কি হবে!

ইশরাত আমার এ কথা শোনার পর মাথা থেকে চুলের ক্লিপ এনে বাম হাতে দিল বারকয়েক আচড়। তাতে তার হাত দিয়ে অঝোরে রক্ত ঝরতে লাগলো।

ঘটনার আকস্মিকতায় অবাক হয়ে গেলাম।

পকেট থেকে রুমাল বের করে তার হাতে পেচিয়ে ধরতেই সে রুমালটিকে ছাড়িয়ে নিয়ে তার রক্তাক্ত হাত মেলে ধরলো আশুলিয়ার সেই ভরা বর্ষার পানির ওপর। টপ টপ করে ফোটায় ফোটায় তার হাত বেয়ে পানিতে মিশে যেতে লাগলো রক্তের অনু-পরমাণুরা। ইশরাত আমায় জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লো। বললো, আমার শরীরের রক্তকে আশুলিয়ার এই ভরা বর্ষার পানিতে মিশিয়ে দিয়ে সাক্ষী করে গেলাম। অঙ্গীকার, শপথ করলাম, আমি তোমার হবোই। কোনো বাধাই তোমার কাছ থেকে আমাকে দূরে রাখতে পারবে না।

সত্যিই আমার জন্য ইশরাতের অমূল্যবান ভালোবাসা অবশেষে জয়ী হয়েছে। সে তার কথা মতো আমাকে বরণ করে নিয়েছে মিলনমালায়। আজও আশুলিয়ায় গেলে আমার সে কথাই মনে পড়ে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেখানকার বর্ষার জল সগৌরবে পান করি।

ইশরাত পাশে থাকলে ক্ষেপে যায়। বলে, আমি থাকতে জল কেন?

খ

খবর হলো, ম্যাডাম দিনাজপুর থেকে ঢাকায় ফিরেছেন। গুলশানের ওয়ার্ড কমিশনার তরিকউল্লাহ সিকদার সে রাতেই ফোন করে আমাকে আবার নিশ্চিত করলেন।

পরদিন সকালেই বনানীতে ম্যাডামের বাসায় গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে একটি ডেট নির্ধারণ করে প্রোগ্রাম সফল করার জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুই করতে লাগলাম। দেশজুড়ে ১৯৯৮ এর বন্যা তখন। বন্যায় ত্রাণ বিতরণ উপলক্ষেই ছিল আমাদের সে প্রোগ্রাম।

ম্যাডাম অর্থাৎ *চকলেটআপা* অবশ্য বলেছিলেন খিলক্ষেত বাসস্ট্যান্ডে সে আয়োজন করতে।

কিন্তু আমি তাকে ওখানকার কিছু জটিলতার কথা বলতেই তিনি আমায় বললেন, যাহোক তাহলে সব আয়োজন তোমার বাসার ছাদেই করো।

নিকুঞ্জসহ আমার টানপাড়া সব তখন পানিতে একেবারে নিমজ্জিত। অর্থাৎ খিলক্ষেত বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত নৌকায় যাতায়াত করতে হয়। নির্ধারিত দিনে নির্ধারিত সময়ের কিছুটা পরে ম্যাডাম এলেন।

আমার বাসায় আসার জন্য ম্যাডামসহ স্থানীয় সাবেক এমপি ও আমি এক নৌকায় যখন উঠলাম তখন ম্যাডাম বললেন তার সাতার না জানার কথা।

খুবই ছোট্ট নৌকা। আস্তে চালাতে বললাম।

কিন্তু ম্যাডাম ভয়ে অস্থির। লক্ষ্য করলাম বিড় বিড় করে তিনি দোয়া কলেমা পড়ছেন।

বাসায় দশ মিনিটের মধ্যেই পৌছালাম। ম্যাডাম বক্তব্য রাখলেন। বন্যাদুর্গত মানুষের জন্য তার সহমর্মিতা প্রকাশ করে ত্রাণ বিতরণ করলেন। বিশেষ ধন্যবাদ দিলেন অনুষ্ঠান আয়োজক আমার প্রতিষ্ঠিত *জিয়া ব্রিগেড*–কে। বিদায় নেয়ার সময় বললেন, আরেকটি ধন্যবাদ দেবো। তবে এখন নয়, খিলক্ষেত বাসস্ট্যান্ড পৌছে।

নেতৃবৃন্দসহ আমরা ভাবলাম না জানি কেমন, কার জন্য তা।

নৌকা থেকে নেমে সবাইকে অবাক করলেন ম্যাডাম। মাঝিরূপী আমাদের মফিজকে বললেন, থ্যাংক ইউ।

গ

গাড়ি চলবে চলার কথা যে রাস্তায় সে রাস্তায় যদি নৌকা চলে তাহলে অনেকটা আজবই লাগে বৈকি। হ্যা, তাই হয়েছিল। ১৯৮৮ সালের প্রলয়ংকরী বন্যায় হঠাৎ কে জানি বললো, স্টাফ রোডের পর থেকে ঢাকা গেটের রাস্তায় আজ সকাল থেকে নৌকা চলছে। কোনো গাড়ি চলাচল করতে পারছে না। লোকজন নাকি জাকি জাল, কারেন্ট জাল দিয়ে প্রচুর মাছ ধরছে।

আমাদের বাড়ির এক ভাড়াটিয়া আংকলকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম মাছ ধরতে। সঙ্গে নিলাম জাকি জাল, মাছ আনার জন্য বড় একটি ব্যাগ। স্পটে গিয়ে রাজপথে নৌকা চলার সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে অবাক না হয়ে পারলাম না। পার হচ্ছে কতো মানুষ। জীবন আর জীবিকার তাগিদে কেউ যেন থেমে নেই।

ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের পুকুরগুলো ছাড়া সমস্ত মাছ বন্যার পানিতে একাকার হয়ে গিয়েছিল বিধায় ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই মাছ দিয়ে আমাদের ব্যাগ পরিপূর্ণ হয়ে যায়। জালটা ভালোভাবে পরিষ্কার করে ধুয়ে কিছুক্ষণ রোদে শুকিয়ে পরমাআনন্দে বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিই।

পথিমধ্যেই আংকল তার শরীর কেমন কেমন লাগছে বলে জানান। দুপুর গড়িয়ে যখন সন্ধ্যা হলো তখন শুনতে পেলাম আংকল আর নেই।

ঘ

ঘরময় পানি আর পানি, থাকার কোনো উপায় নেই। বাড়ির লোকজন সবাই চলে গেছে মামাবাড়ি। আমি খালি বাড়িতে একা থাকি। তার মানে চৌকির ওপর বসবাস। বন্যার পানি চৌকি ছুই ছুই অবস্থা। তাছাড়া ১৯৮৮ সালের বন্যায় আমার বাড়ির পাশেই, জিয়া এয়ারপোর্টের পশ্চিম পাশের রানওয়েতেও পানি উঠে গিয়েছিল। এর জন্য বেশ কয়েকদিন বিমান ল্যান্ডিংও বিঘ্নিত হয়।

যাহোক, খালি বাড়িতে একা থাকলেও কোনো ভয়–ডর আমার ছিল না। তবে সাপকে জন্মের মতো ভয় পেতাম। একদিন রাতে টয়লেটের বেগ পাওয়াতে কলা গাছের ভেলায় বাড়ির একটু বাইরে গিয়ে ভেলায় বসেই টয়লেট সারছিলাম। জ্যোৎস্নার আলোতে হঠাৎ দেখলাম আমার ঠিক উল্টো পাশে অর্থাৎ ভেলার দিকেই কি যেন সাতরে এগিয়ে আসছে। হাতে থাকা টর্চ লাইটের আলো তার ওপর ফেলতেই দেখি মস্তবড় কালো রঙের একটি জাত সাপ ভেলায় আশ্রয় নিয়েছে। তখন ভয়ে আমার কলজে শুকিয়ে টয়লেটের বেগ পালিয়ে গেল ভেলা থেকে।

সাপ সরছে না দেখে ভয়ে আমিও নড়াচড়া করতে পারছি না। লাইটটি ভেলায় রেখে অবশেষে উপায়ান্তর না দেখে আস্তে ভেলা থেকে পানিতে নেমে দিই ডুব।

সকালে ঘুম থেকে উঠে যখন ভেলার কাছে গিয়েছি তখন দেখি সাপ নেই। সঙ্গে নেই রাতে ভেলায় সযত্নে রেখে যাওয়া প্রিয় *এভারেডি* লাইটটি।

৬

ব্যাঙ–এর ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর আওয়াজের মধ্যেই সাত–সকালে নৌকা নিয়ে বের হয়েছি বিলে পেতে রাখা জাল চেক করতে। বিলে যেতেই দুই চোখ আমার জুড়িয়ে গেল। চার পাশে ফুটে রয়েছে হাজারও শাপলা। কি অপলক চোখে, পবিত্র শুভ্রতায় তারা যেন ছেয়ে আছে পুরো বিলটায়। কোনো ভেদাভেদ নেই, নেই দলাদলি। তারা যেন এক অভিন্ন। মনটা অন্য রকম ভালো লাগায় ভরে গেল।

কি আর মাছ ধরবো, ফিরে আসছি। আসতেই দেখি বিলের পানিতে ভাসছে অতি ক্ষুদ্র একটি শিশুর দেহ। কে জানে কার আনন্দের ফসল সে। আর কেই বা সেই ডাইনি যে একে প্রসব করে অবহেলা, অনাদরে এভাবে ছুড়ে ফেলেছে!

জিনসন, দক্ষিণ কোরিয়া থেকে

ডাম্বফেরি থোবাল

– মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান

ছোটবেলা থেকেই ঢাকা শহর সম্পর্কে একটা কৌতূহল ছিল। সেখানকার নানান রঙের মানুষ, নানান রঙের জিনিস আমাকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করতো। কিন্তু সেই রকম কোনো নিকট আত্মীয় ঢাকা শহরে না থাকাতে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। ব্যবসায়িক কাজে চাচা প্রায়ই ঢাকা গেলেও তার সঙ্গে যেতে পারিনি। কারণ তিনি নাইট কোচে গিয়ে সারা দিন কাজ সেরে আবার নাইট কোচেই ফিরে আসতেন। তারপরও তার পেছনে লেগেই থাকতাম একবার ঢাকা শহরে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

চাচা বলতেন, তুই এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে নে, তারপর তোকে নিয়ে ঢাকা শহর ঘুরবো।

আশায় আশায় দিন গুণতে গুণতে এক সময় এসএসসি পরীক্ষা সম্পন্ন করলাম।

২৩ মে ১৯৯০–এ দিন ধার্য করা হলো। যথাসময়ে সকাল আটটায় *চুয়াডাঙ্গা ডিলাক্স*–এ চেপে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আমার ভেতরে একটা চাপা উত্তেজনা কাজ করছে। এতো দিনে আমার স্বপ্ন পূরণ হতে যাচ্ছে শিশু পার্ক, চিড়িয়াখানা, জাদুঘর দেখবো বলে।

রাস্তার দুই পাশে নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখতে দেখতে বারোটায় গোয়ালন্দ ঘাটে পৌছালাম। বিশাল পদ্মাকে এতো কাছ থেকে দেখে অভিভূত হলাম। গাড়ি ফেরিতে ওঠার জন্য লাইনে দাড়ালো। ফেরির অদ্ভুত নাম দেখে হকচকিয়ে গেলাম। এটা কি ধরনের নাম *ডাম্বফেরি থোবাল!*

যাহোক, গাড়ি ফেরিতে উঠলো। গাড়ি থেকে নেমে আসতে বললেন চাচা।

তারপর দুজনে মিলে ফেরির দোতলায় গেলাম। দোতলা থেকে পদ্মার সুবিস্তৃত সৌন্দর্য উপভোগ করতে লাগলাম।

এক পর্যায়ে চাচা বললেন, তুই এখানে দাড়া, আমি তোর জন্য নিচ থেকে কমলা কিনে আনি।

চাচা চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর দেখি ফেরিটা নড়ে উঠলো। কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখি আমার ফেরিটা আলাদা হয়ে যাচ্ছে। দিকবিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। চাচা বলে চেচিয়ে উঠলাম।

দূর থেকে দেখলাম চাচা অন্য একটা ফেরিতে দাড়িয়ে হাত নাড়ছেন। আমি একা ঢাকা চলে যাচ্ছি যেখানে শুনেছি কতো ধরনের বাজে লোকের বসবাস। এ কথা ভাবতেই আমার মেরুদণ্ড ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই ফেরি থেকে পানিতে ঝাপ দিলাম। সাতার জানতাম না। তবুও ঝাপ দিয়েছি বাচার জন্য। তারপর মনে হলো পানির নিচে আমাকে যেন কেউ পা দুটো ধরে পাতালপুরীতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। শত চেষ্টা করেও উপরে উঠতে পারছিলাম না। হাতে ডাব এবং বাদামের খোসার মতো কিছু একটা অনুভব করলাম। এরপর সব কিছু ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে গেল।

একটা কাশি দিয়ে যখন আমার জ্ঞান ফিরলো তখন দেখি শ শ মাথা আমাকে দেখছে। আমি পাটাতনের ওপর শুয়ে আছি। কাকে যেন বলতে শুনলাম মায়ের দুধের জোরে এ যাত্রা বেচে গেল।

আমার আর ঢাকা যাওয়া হলো না। বাড়িতে ফেরত এলাম। পরে শুনেছি ওই দিন আমার জন্য ফেরি আধ ঘণ্টা দেরি করে ছেড়েছে। পানিতে ঝাপ দেয়ার পর ফেরির কিছু লোক আমাকে উদ্ধার করেছিল। না হলে আমার আজ এই সুন্দর পৃথিবীতে থাকার কথা নয়। আমি তাদের কাছে চিরঋণী।

ওই দিন ওটা ছিল টানা ফেরি। আমি ইঞ্জিনের ওপর দাড়িয়েছিলাম। ইঞ্জিনটা ঘুরে এসে ফেরির অন্যদিকে সংযুক্ত হয়ে টেনে নিয়ে যায়। ওটা যখন আলগা হয়ে যাচ্ছিল তখন মনে করেছিলাম এটা বুঝি একাই চলে যাচ্ছে।

এরপর ঢাকায় পড়াশোনার সুবাদে অনেকবার একা যাওয়া আসা করেছি। কোনোদিন এ রকম ভুল হয়নি। যমুনা সেতু হওয়ার পর ডাম্বফেরি থোবাল আর দেখা যায় না। এর বদলে নগরবাড়ী ঘাটের বড় বড় ফেরিগুলো চলে এসেছে। পদ্মা সেতু হওয়ার পর ফেরি হয়তো দেখা যাবে না। তখন ফেরি কেবলই স্মৃতি হয়ে থাকবে।

শেখপাড়া, চুয়াডাঙ্গা থেকে
ash_kbd@yahoo.com

ফেইল্লা

– এস. আলম শামীম

আমি এক হতভাগ্য প্রেমিক। মাতৃভূমির মেয়েদের পোশাকি প্রেমের গরম ছ্যাকায় আমি আজ ক্ষতবিক্ষত। কলেজ পড়ুয়া সেই মেধাবী আমার আজকের পরিচয়ে এক ব্যর্থ প্রেমিক। গ্রামের ভাষায় ফেইল্লা।

হানড্রেড পারসেন্ট হালাল প্রেম পাওয়া মুশকিল। ভেজাল প্রেমের মায়াজালে আটকে আজ প্রতারিত আমি। সেদিন বুঝতেও পারিনি তার টানা টানা চাহনির অন্তরালে ছিল ছলনা। তাই তো ওই দুই চোখের আকর্ষণে কবে যে তার প্রেমে হাবুডুবু খাওয়া শুরু করলাম তা টেরই পাইনি। যেদিন পেলাম সেদিন শকড হলাম। সেই থেকে এলোমেলো এই আমি। নাহ, তার কোনো দোষ দিই না। তার চেহারা দেখেই ভালোবেসে ফেলেছিলাম।

এবার আসল ঘটনায় আসা যাক। বর্ষা মরসুমের কোনো একদিনে কলেজ থেকে নৌ পথে পিকনিকের আয়োজন করা হয়। মার কাছে টাকা চেয়েই এমনভাবে তাকালেন, দ্বিতীয়বার তার চোখের দিকে তাকানোর সাহস হলো না।

নিরানব্বই রানে বোল্ড হওয়ার মতোই ভারাক্রান্ত মন। পিকনিকের আশা বাদ। ভালো লাগছে না কোনো কিছুই।

মন ভালো হওয়ার মতো ঘটনা ঘটলো বিকেলে। আমার নায়িকা শিমু এসে বললো, পিকনিকের যাবতীয় খরচ তার। শুধু একটা মাত্র শর্ত। পিকনিক স্পটের অনতিদূরের পলাশতলা ডাকবাংলো বেড়িয়ে আনতে হবে।

এ আর এমন কি! তাছাড়া তার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক তা কলেজের প্রায় সবারই জানা। তাই নির্দ্বিধায় রাজি হয়ে গেলাম।

জীবনের প্রথম নৌ যাত্রা দারুণ রোমাঞ্চকর মনে হলো। শান্ত-স্নিগ্ধ নদী বক্ষে আমাদের নৌকাটি প্রায় চল্লিশজনের বহর নিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলো। নদীর ওপারের কাশবনের পরে আকাশ যেন মাটির সঙ্গে মিতালি করেছে। কোথাও কোথাও নদী গর্ভে ডুবে গেছে ফসলের মাঠ। অনেকটা আক্রমণের ভঙ্গিমায় দখল করে নিয়েছে যেন। উন্মাদ নদী তার সর্বগ্রাসী অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। ফুরফুর বিশুদ্ধ বায়ু মাঝে মধ্যে মৃদু-মন্দ পরশ বুলিয়ে যাচ্ছিল সারা শরীরে। সানগ্লাসটা আর নাকে বসে কানে ধরে রইলো না বিধায় অবশেষে তাকে ব্যাগের মধ্যে লুকোতে হলো।

এতোক্ষণ যে একটা ঘোলাটে ভাব ছিল তা কেটে গিয়ে সব কিছু ফর্শা লাগলো। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে আমরা আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌছলাম। বাক্স-পেটরা নামিয়ে সবাই যার যার কাজে লেগে গেল।

সবাই যখন ব্যস্ত হয়ে উঠলো তখন আমি আর শিমু দুজনে একটা রিকশা নিয়ে পলাশতলা ডাকবাংলোর দিকে এগোতে লাগলাম। বাংলো পর্যন্ত আর যেতে হয়নি। দেখি আমাদের পাশের বাড়ির জাকির মিয়া। প্রথমটায় ওখানে কেন দাড়িয়ে আছে তা আমার মাথায় আসেনি। তখন বুঝলাম যখন দেখি শিমু রিকশা থেকে তার দেরি হওয়ার বিবরণ পেশ করছে।

মাথাটায় প্রচণ্ড হাতুড়ির বাড়ি পড়লো যেন। সমস্ত রক্ত কণিকায় ঝমঝম আওয়াজ শুরু হলো। রাগ সংবরণ করতে না পেরে এক লাফে রিকশা থেকে নামলাম, আরেক লাফে তাদের কাছে পৌছালাম। আচ্ছা মেয়ে তো তুমি, আমাকে বসিয়ে রেখে আরেকজনের সঙ্গে বিশ মিনিট অবলীলায় সেরে আসতে পারবে তুমি।

বাজে বকবে না, আমি কি তোমাকে কখনো বলেছি, ভালোবাসি তোমাকে? বললো শিমু।

আশ্চর্য! বলতে হবে কেন? এতো দিনের চোখাচোখি, আইসক্রিম, কফিবার, সিনেমা সব, সব মিথ্যা?

বোঝা হয়ে গেল এতো দিনে আমার সরলতার সুযোগ নিয়ে মানিব্যাগটাকে রোগা বানানোই ছিল তার আসল উদ্দেশ্য। তার সুন্দর চেহারাটাও আমাকে বোকা বানানোর জন্য যথেষ্ট ছিল।

সেদিন আর সবার সঙ্গে যোগ দেয়া সম্ভব হয়নি। অন্য পথে পালিয়ে এসেছিলাম।

আজ এতো দিন পরেও নৌকা ভ্রমণের কথা মনে উঠলেই বুকের মধ্যে কেমন যেন ছলাৎ ছলাৎ শব্দ শুনতে পাই। মনে হয় যেন কোনো কিছু হারানোর জন্য সাদর আমন্ত্রণ।

সাভার, ঢাকা থেকে